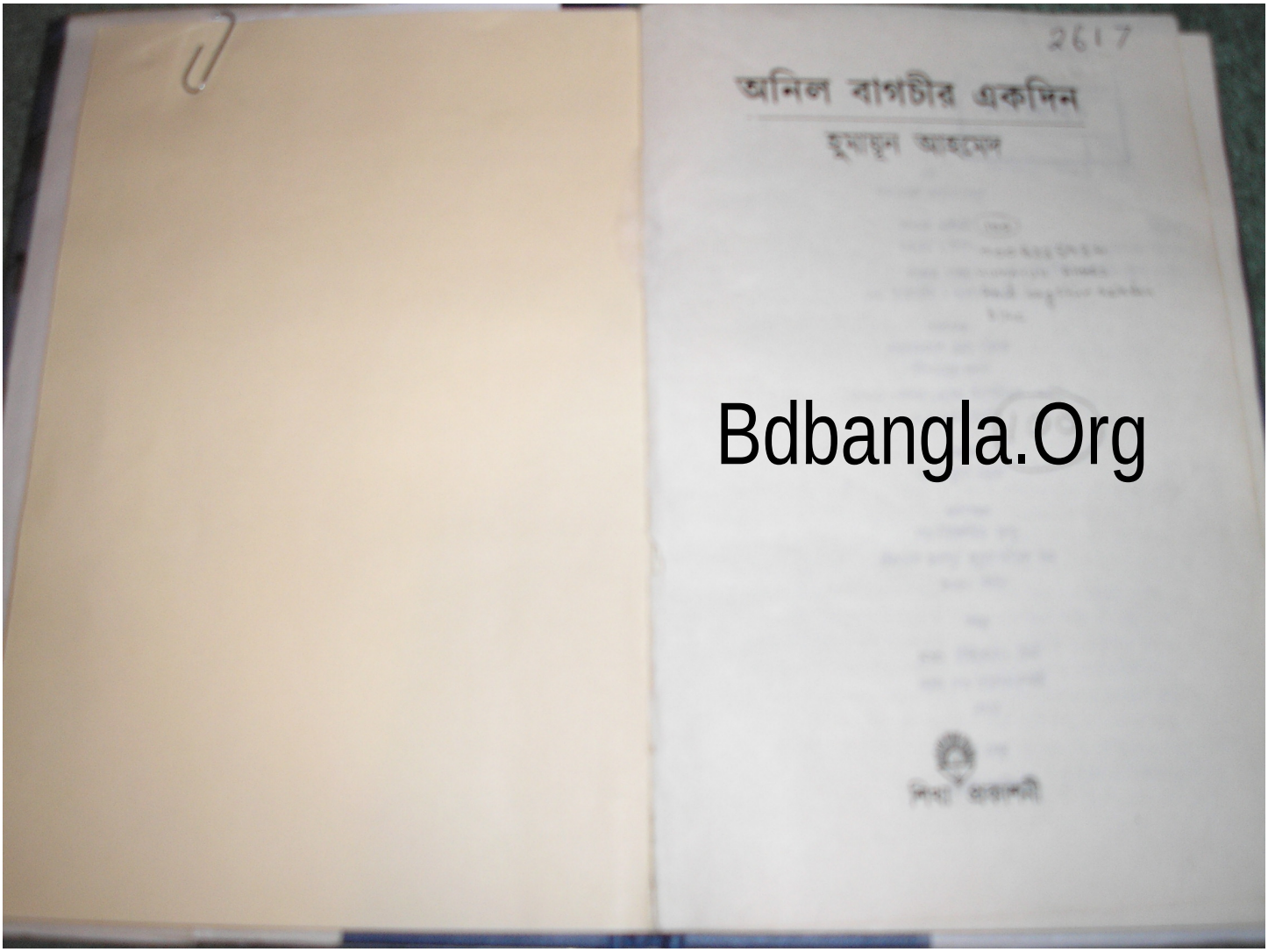
2617
অনিল বাগচীর একদিন
হুমায়ূন আহমেদ
Bdbangla.Org
শিখা প্রকাশনী

T00 8335936
LIBRARY & INFORMATION SERVICES
05 MAR 1994
BB LEN
B17 569 964 X

©
গুলতেকিন আহমেদ

দ্বিতীয় প্রকাশ
ফেব্রু ঃ ১৯৯২

প্রথম প্রকাশ
১৯শে ফেব্রু ঃ বইমেলা ৯২

প্রকাশক
কাজী মোঃ শাহজাহান
শিখা প্রকাশনী
৬৫, প্যারিদাস রোড, ঢাকা—১১০০
ফোন ২৩৫২৫৯

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

কম্পোজ
নৃশা কম্পিউটারস
৩৪ আজিমপুর সুপার মার্কেট
ঢাকা ১২০৫

মুদ্রণ
নিউ সোসাইটি প্রেস
জিন্দাবাহার এম লেন
ঢাকা

মূল্য ঃ
বিয়াল্লিশ টাকা

Bdbangla.Org

উৎসর্গ
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস
এ সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ।

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও — আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাব ; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে ;
দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হ'য়ে আসে
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে — একবার — দুইবার — তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে ;
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ — সাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে ঃ

জীবনানন্দ দাশ

১

কেউ কি হাঁটছে বারান্দায়?

পা টিপে টিপে হাঁটছে?

অনিল বাগচী শুয়েছিল, উঠে বসল। তার শরীর ঝিম ঝিম করছে, পানির পিপাসা লেগেছে। সামান্য শব্দেই তার এখন এমন হচ্ছে। শরীরের কলকব্জা সম্ভবত সবই নষ্ট হয়ে গেছে। মাথার ভেতরটা সারাক্ষণ ফাঁকা লাগে। তার নাক পরিষ্কার, সর্দি নেই, কিছু নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে সে হা করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

আবার পায়ের শব্দ। শব্দটা কি বারান্দায় হচ্ছে না রাস্তায় হচ্ছে? অনিলের কান এখন খুব তীক্ষ্ণ। অনেক দূরের শব্দও সে এখন পরিষ্কার শুনতে পায়। হয়ত রাস্তায় কেউ হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু রাতের বেলা কে হাঁটবে রাস্তায়? এখনকার রাত অন্যরকম রাত। দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকার রাত। রাস্তায় হেঁটে বেড়াবার রাত না।

কা–কা শব্দে কাক ডাকল। অনিল ভয়ংকর চমকে উঠল। এমন চমকে উঠার কিছু না। একটা কাক তার জানালার বাইরে বাসা বেঁধেছে। সে তো ডাকবেই, কিন্তু কা–কা শব্দটা ঠিক যেন তার মাথার ভেতর হয়েছে। কাকটা যেন তার মগজে পা রেখে দাঁড়িয়েছিল। কা–কা করে ডেকে ঠোঁট দিয়ে অনিলের মাথার মগজ খানিকটা ঠোকরে নিল। ব্যথায় শরীর পাক খাচ্ছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ।

এতটা ভয় নিয়ে বেঁচে থাকা কি সম্ভব? এরচে' মরে যাওয়া কি অনেক সহজ না? বাড়ির ছাদে উঠে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়? ছাদে উঠার দরজাটা কি খোলা? মেসের মালিক কামাল মিয়া ভারি ভারি সব তালা লাগিয়েছেন। সদর দরজায় ভেতর থেকে দু'টা তালা লাগানো হয়। ছাদে যাবার দরজাও নিশ্চয়ই বন্ধ। সেখানেও তালা।

অনিল হাত বাড়িয়ে পানির জগ নিল। তার গ্লাস ভেঙ্গে গেছে, জগে মুখ লাগিয়ে পানি খেতে হয়। শোবার সময় সে জগ ভর্তি করে পানি এনে রাখে। কিছুক্ষণ পর পর কয়েক ঢোক করে পানি খায়। ভোরের মধ্যে পানির জগ শেষ হয়ে যায়।

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও — আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাব ; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে ;
দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হ'য়ে আসে
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে — একবার — দুইবার — তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে ;
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ — সাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে ঃ

জীবনানন্দ দাশ

১

কেউ কি হাঁটছে বারান্দায়?

পা টিপে টিপে হাঁটছে?

অনিল বাগচী শুয়েছিল, উঠে বসল। তার শরীর ঝিম ঝিম করছে, পানির পিপাসা লেগেছে। সামান্য শব্দেই তার এখন এমন হচ্ছে। শরীরের কলকব্জা সম্ভবত সবই নষ্ট হয়ে গেছে। মাথার ভেতরটা সারাক্ষণ ফাঁকা লাগে। তার নাক পরিষ্কার, সর্দি নেই, কিছু নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে সে হা করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

আবার পায়ের শব্দ। শব্দটা কি বারান্দায় হচ্ছে না রাস্তায় হচ্ছে? অনিলের কান এখন খুব তীক্ষ্ণ। অনেক দূরের শব্দও সে এখন পরিষ্কার শুনতে পায়। হয়ত রাস্তায় কেউ হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু রাতের বেলা কে হাঁটবে রাস্তায়? এখনকার রাত অন্যরকম রাত। দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকার রাত। রাস্তায় হেঁটে বেড়াবার রাত না।

কা–কা শব্দে কাক ডাকল। অনিল ভয়ংকর চমকে উঠল। এমন চমকে উঠার কিছু না। একটা কাক তার জানালার বাইরে বাসা বেঁধেছে। সে তো ডাকবেই, কিন্তু কা–কা শব্দটা ঠিক যেন তার মাথার ভেতর হয়েছে। কাকটা যেন তার মগজে পা রেখে দাঁড়িয়েছিল। কা–কা করে ডেকে ঠোঁট দিয়ে অনিলের মাথার মগজ খানিকটা ঠোকরে নিল। ব্যথায় শরীর পাক খাচ্ছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ।

এতটা ভয় নিয়ে বেঁচে থাকা কি সম্ভব? এরচে' মরে যাওয়া কি অনেক সহজ না? বাড়ির ছাদে উঠে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়? ছাদে উঠার দরজাটা কি খোলা? মেসের মালিক কামাল মিয়া ভারি ভারি সব তালা লাগিয়েছেন। সদর দরজায় ভেতর থেকে দু'টা তালা লাগানো হয়। ছাদে যাবার দরজাও নিশ্চয়ই বন্ধ। সেখানেও তালা।

অনিল হাত বাড়িয়ে পানির জগ নিল। তার গ্লাস ভেঙ্গে গেছে, জগে মুখ লাগিয়ে পানি খেতে হয়। শোবার সময় সে জগ ভর্তি করে পানি এনে রাখে। কিছুক্ষণ পর পর কয়েক ঢোক করে পানি খায়। ভোরের মধ্যে পানির জগ শেষ হয়ে যায়।

ভয়। তীব্র ভয়। সারাক্ষণ ভয়ে অনিলের শরীর কাঁপে। সে অবশ্যি জন্ম থেকেই ভীতু ধরনের। ছোটবেলায় অন্ধকারে কখনো ঘুমুতে পারত না। বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হত। সেই সময়টা আবার ফিরে এসেছে। এখন সে অন্ধকারে ঘুমুতে পারে না। রাত এগারোটার পর বাতি নিভিয়ে দিতে হয়। সে জেগে থাকে। মাঝে মাঝে অন্ধকার অসহ্য বোধ হলে বালিশের নিচে রাখা টর্চ জ্বালায়। তীরের মত আলোর ফলা দেয়ালের নানান জায়গায় ফেলে। ঘরের অন্ধকার তাতে কমে না। খুব সামান্য অংশই আলোকিত হয়। বাকি ঘরে আগের মতই অন্ধকার থাকে। অন্ধকার কমে না। অনিলের ভয়ও কমে না। অনিল বালিশের নিচ থেকে দু' ব্যাটারীর টর্চটা বের করল। আলো ফেলল দেয়ালে। আলো তেমন জুরালো না। ব্যাটারী কিনতে হবে। কি কি কিনতে হবে তা দিনে মনে থাকে না। রাতে শুধু মনে হয়। টর্চের ব্যাটারী, একটা পানির গ্লাস, মোমবাতি, কাগজ, লেখার কাগজ। কাল রাতে চিঠি লেখার ইচ্ছা করছিল। কাগজের অভাবে চিঠি লেখা হয়নি।

অনিল টেবিলে রাখা টেবিল ঘড়িটিতে আলো ফেলল। রাত বেশি না, কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। সে এবার আলো ফেলল দেয়ালে। আলোটা পড়ল ঠিক ক্যালেণ্ডারটার উপর। অমুধ কোম্পানীর চোখে বাংলাদেশ। পালতোলা নৌকা যাচ্ছে। মাঝি হাল ধরে বসে আছে। তার মুখভর্তি হাসি। তার হাসি দেখে মনে হতে পারে নৌকার হাল ধরে বসে থাকার মধ্যেই জীবনের পরম শান্তি।

ক্যালেণ্ডারের পাশেই স্বামী বিবেকানন্দের বাঁধানো ছবি। অনিলের বাবা এই ছবি ছেলেকে উপহার হিসাবে দিয়েছেন। ছবিটির নিচে বিবেকানন্দের একটি বাণী লেখা। বাণীটি হচ্ছে — যে ঈশ্বর মানুষকে ইহকালে ক্ষুধার অন্ন দিতে পারেন না তিনি পরকালে তাদের পরম সুখে রাখবেন তা আমি বিশ্বাস করি না।

ছবির বিবেকানন্দ রাগী চোখে তাকিয়ে আছেন। ঘরের যে দিকে যাওয়া যাক মনে হবে স্বামীজী সে দিকেই তাকিয়ে আছেন। রাগ ছাড়াও তাঁর চোখের ভাষায় এক ধরনের ভর্ৎসনা আছে। তিনি যেন বলছেন, 'রে মূর্খ, জীবনটা নষ্ট করছিস কেন?'

অনিল টর্চ লাইটের আলো নিভিয়ে ফেলল। ছবিটা সরানো দরকার। নষ্ট করে ফেলা দরকার, কিংবা লুকিয়ে ফেলা দরকার। বিবেকানন্দের ছবি ঘরে রাখা এখন ভয়াবহ ব্যাপার। ছবিটা সরাতে হবে। এখনই কি সরাবে? আবার কাক ডাকল। অনিল ভয়ে একটা ঝাঁকুনি খেল। অনিলের বাবা রূপেশ্বর মডেল হাই স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক সুরেশ বাগচী, ছেলের চরিত্রে অস্বাভাবিক ভয়ের ব্যাপারটি লক্ষ্য

করেই বোধহয় ছেলের খাতায় একদিন বড় বড় করে লিখে দিলেন —

''Cowards die many times before their death.''

গম্ভীর গলায় বললেন, রোজ সকালে এই লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকবি। ধ্যান করবি। লেখাটার মানে হল — ভীতুদের মৃত্যুর আগেও অনেকবার মৃত্যুবরণ করতে হয়। যে সে মানুষের লেখা না। শেকসপিয়ারের লেখা। দেখি শেকসপিয়ার বানান কর তো? সুরেশ বাগচীর অভ্যাসই হচ্ছে যে কোন কথা বলেই ফট করে বানান জিজ্ঞেস করা। অনিল ক্লাস থ্রীতে যখন পড়ে তার পেটে তীব্র ব্যথা শুরু হল। সুরেশ বাবু ছেলেকে কোলে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন। পথে নেমেই বললেন, ব্যথা বেশি হচ্ছে বাবা?

অনিল কাঁদতে কাঁদতে বলল, হুঁ।

'খুব বেশি?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা বাবা বল তো ব্যথার ইংরেজী কি?'

অনিল চোখ মুছতে মুছতে বলল, পেইন।

'এই তো হয়েছে। আচ্ছা বাবা, এখন পেইন বানান কর তো। কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ব্যথা কম লাগবে। বানান কর তো পেইন। আচ্ছা, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। প্রথম অক্ষর হল পি।'

সুরেশ বাগচীর প্রাণপণ চেষ্টাতেও অনিলের ইংরেজী বিদ্যা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ইংরেজীতে আই.এ পরীক্ষায় রেফার্ড পেয়ে গেল। সুরেশ বাগচী মনের দুঃখে পুরো দিন না খেয়ে রইলেন। এবং সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ করে ছোট ছেলেমেয়েদের মত শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। অনিল শুকনো মুখে বারান্দায় বসে রইল। অনিলের বড় বোন অতসী বাবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলতে লাগল, দরজা খোল বাবা। দরজা খোল। সুরেশ বাগচী বললেন, এই কুলাঙ্গারকে বেরিয়ে যেতে বল অতসী। কুলাঙ্গারের মুখ দেখতে চাই না। অনিল ঘর থেকে বের হয়ে একা একা রূপেশ্বর নদীর ঘাটে বসে রইল।

অন্ধকার রাত। জনমানব শূন্য নদীর ঘাট। ওপারে শ্বশান, মরা পুড়ানো হয়। কয়দিন আগেই মরা পুড়িয়ে গেছে। ভাঙ্গা কলসী, পোড়া কাঠ আবছা করে হলেও নজরে পড়ে। অনিলের গা ছমছম করতে লাগল। মনে হতে লাগল অশরীরী মানুষজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। নিঃশব্দে চলাফেরা করছে তাকে ঘিরে। এই

তো কে যেন হাসল। শিয়াল ডাকছে। শিয়ালের ডাক এমন ভয়ংকর লাগছে কেন? অনিল ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে যে দৌড়ে বাড়ি চলে যাবে সেই সাহসও রইল না।

গভীর রাতে হারিকেন হাতে সুরেশ বাগচী ছেলেকে খুঁজতে এলেন। নদীর পাড়ে এসে কোমল গলয় বললেন, অনিল বাবা, আয় বাড়ি যাই। তিনি হাত ধরে ছেলেকে নিয়ে এগুতে লাগলেন। এক সময় বিস্মিত হয়ে বললেন, এমন কাঁপছিস কেন?

'ভয় লাগছে বাবা।'

'আরে বোকা, কিসের ভয়? শেকসপিয়ার কি বলেছিলেন, কাউয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ। ভীতুদের মরবার আগেও অনেকবার মরতে হয়। বল তো শেকসপিয়ারের কোন্ বই-এ এই লেখাটা আছে। তোকে আগে একবার বলেছি। কি, পারবি না?'

ছেলেবেলার অন্ধ, তীব্র ভয় আবার ফিরে এসেছে। অনিল এখন ঘুমুতে পারে না। রাত জেগে জেগে নানান ধরনের শব্দ শুনে। আতংকে কেঁপে কেঁপে উঠে। সবচে' বেশি ভয় পায় যখন কাক ডেকে উঠে। আচমকা এই কাকটা কা-কা করে আত্মা কাঁপিয়ে দেয়।

পরিষ্কার চটি পায়ে হাঁটার শব্দ। কে হাঁটছে চটি পায়ে? রহিম সাহেব? রহি সাহেবের মাঝে মাঝে গভীর রাতে হাটার অভ্যাস আছে। তাঁর তো আজ সকালে চলে যাবার কথা ছিল। যেতে পারেন নি? অনিল বলল, কে? কে হাঁটে?

কেউ জবাব দিল না। হুস করে একটা ট্রাক চলে গেল। কুকুর ডাকছে। ঢাকা শহরের কুকুরগুলি এখন খুব ডাকছে। মিলিটারী না-কি অনেক কুকুর মেরেছে। রাত দুপুরে কুকুরগুলি আচমকা ডেকে উঠে — মিলিটারীরা ভয় পেয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে। কুকুর এখন মিলিটারী চিনে ফেলেছে। হঠাৎ কোন রাস্তা কুকুরশূন্য হলে বুঝতে হবে মিলিটারী সেখানে আছে। কিংবা তারা আসছে। বাঘের আগে ফেউ ডাকার মত, মিলিটারীর আগে কুকুর ডাকে।

পায়ের শব্দটা আবার আসছে। ঠিক তার দরজার কাছে এসে শব্দ থেমে গেল। অনিল ক্ষীণ স্বরে বলল, কে? তার নিজের গলার শব্দ সে নিজেই শুনতে পেল না। তাকে ধরার জন্যে কি মিলিটারী চলে এসেছে? একটু আগে যে ট্রাকের শব্দ শোনা গেল, সেই ট্রাকে করেই কি তাকে অজানা কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে? সে দরজা খুলবে আর তাকে নিয়ে ট্রাকে তুলবে। এরা কি গাড়িতে তোলার সময় চোখ বেঁধে তুলে? কেন তাকে শুধু শুধু তুলবে? সে তো কিছুই করে নি। সে কোন মিছিলে যায়নি। তার ভয় লাগে। সাতই মার্চের ভাষাণ শোনার জন্য রেসকোর্সের

মাঠে যাবার ইচ্ছা ছিল, তবু যায়নি। তার মন বলছিল ঝামেলা হবে। কয়েকটা টিয়ার গ্যাস ফেললেই ঝামেলা লেগে যাবে। লোকজন ছোটাছুটি শুরু করবে। মরতে হবে মানুষের পায়ের নিচে চাপা পড়ে।

জন্মাষ্টমীর রথযাত্রা উপলক্ষে বিরাট মেলা হয় নান্দিগ্রামে। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে সেই মেলা সে দেখতে গেল। কি প্রচণ্ড ভীড়! যাতে হারিয়ে না যায় সে জন্যে সে দু'হাতে শক্ত করে বাবার হাত ধরে রাখল। তারপরেও সে হারিয়ে গেল। লোকজনের চাপে ছিটকে কোথায় চলে গেল। মেলার সবগুলি মানুষ যেন হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। যে যে দিকে পারছে ছুটছে। বেদেনীর সাপের ঝুড়ি থেকে দু'টা কাল সাপ না-কি বের হয়ে পড়েছে। ছোটাছুটি এই কারণে। অনিল দৌড়াচ্ছিল চোখ বন্ধ করে। হঠাৎ কে যেন তাকে ধরে ফেলল। অনিল তাকাচ্ছে কিন্তু কিছু দেখছে না। তার চোখে সব দৃশ্য এলোমেলো হয়ে গেছে। শুধু সে শুনছে বুড়ো এক ভদ্রলোক বলছেন, এই ছেলেটা এমন করছে কেন? এ কেমন যেন নীল হয়ে যাচ্ছে। এই ছেলেটাকে বাতাস কর। ছেলেটাকে বাতাস কর।

অনিল সারাজীবন সব রকম ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। আর আশ্চর্য! বেছে বেছে তাকেই একের পর এক ঝামলোয় পড়তে হয়েছে। রূপেশ্বরে এক পাগলি আছে — 'মোক্তার পাগলি'। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তাকে মোক্তার বললেই বাঘিনীর মত ছুটে যায়। বাচ্চা-কাচ্চারা তাকে দেখলেই ঢিল ছুড়ে। 'মোক্তার' বলে চিৎকার করে ক্ষেপায়। পাগলি তাদের তাড়া করে। অনিল কোনদিন মোক্তার পাগলিকে দোখে হাসে নি। তার গায়ে ঢিল ছুড়েনি কিংবা মোক্তার বলে চেঁচায়নি। তারপরেও এই পাগলি শুধু তাকেই খুঁজে বেড়াত। দেখা হলেই তাড়া করত। হয়ত সে বই নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। বটগাছের আড়াল থেকে মোক্তার পাগলি বের হয়ে এল। বই-খাতা ফেলে অনিল ছুটছে। পেছনে পেছনে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছে মোক্তার পাগলি। রূপেশ্বরে এটা ছিল সাধারণ ঘটনা। কেউ অনিলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসত না। দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখত। কেউ কেউ হাত তালি দিয়ে চেঁচাত — "লাগ ভেলকি লাগ।"

একদিন অনিল ধরা পড়ে গেল মোক্তার পাগলির হাতে। তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। হাফইয়ার্লি পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরছে। পোস্টাপিসের কাছে আসামাত্র মোক্তার পাগলি ছুটে এসে অনিলকে হাত চেপে ধরল। মেলায় যেমন হয়েছিল অনিলের সে রকম হল। মনে হল সে কিছু দেখতে পারছে না। তার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। এক্ষুণি বোধহয় হৃৎপিণ্ড ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। নাক দিয়ে সে নিঃশ্বাস

Bdbangla.Org

নিতে পারছে না। হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। চারদিকে লোক জমে গেছে। সবাই মজা দেখছে। বড়ই মজাদার দৃশ্য।

মোক্তার পাগলি এক ঝটকায় অনিলকে কোলে তুলে ফেলল। তার অনাবৃত স্তনে অনিলের মুখ চেপে বলল, খা দুধ খা। খা কইলাম।

দর্শকরা বিপুল আনন্দে হেসে ফেলল। অনিলের নাম হয়ে গেল "দুদু খাওয়া অনিল"। দু'টি অনিল ছিল ক্লাসে। একজন শুধু অনিল, অন্যজন দুদু খাওয়া অনিল।

অনিল ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দিল। স্কুলের সময় দরজা বন্ধ করে বসে থাকত। চেঁচিয়ে কাঁদত। অতসী বাবাকে গিয়ে বলত, থাক বাবা, আজ স্কুলে না গেল। একদিন সুরেশ বাগচী ছেলেকে ডেকে বললেন, তোকে দুধ খাইয়েছে তো কি হয়েছে? মাতৃস্নেহে দুগ্ধপান করানোর চেষ্টায় দোষের কিছু না। মাতৃভাবে তাকে সম্মান করবে, তাহলেই হবে। আয় তোর ভয় ভাঙ্গিয়ে দিয়ে আসি।

অনিল বলল, না।

'না বলবি না। না বলা দুর্বল মানুষের লক্ষণ। আয় আমার সাথে। অতসী তোর মা'র একটা শাড়ি বের করে দে।'

অতসী বলল, শাড়ি কি করবে?'

'মোক্তার পাগলিকে দেব।' নগ্ন ঘুরে বেড়ায় দেখতে খারাপ লাগে।'

'মা'র শাড়ি কাউকে দিতে দিব না বাবা।'

'নতুন শাড়ি কেনার পয়সা নাইরে মা। দে, তোর মা'র একটা শাড়ি দে। মা'র স্মৃতি তো শাড়িতে থাকে না রে মা। মা'র স্মৃতি থাকে অন্তরে।'

এক হাতে লাল পাড় শাড়ি নিয়ে অন্য হাতে শক্ত করে অনিলের হাত ধরে সুরেশ বাগচী নগ্ন পাগলিকে খুঁজে বের করলেন। পাগলি কঠিন চোখে তাকাল। সুরেশ বাগচী বললেন, আমার এই পুত্র আপনার ভয়ে অসম্ভব ভীত। আমি শুনেছি আপনি তাকে পুত্রস্নেহে দুগ্ধ পান করাবার চেষ্টা করেছেন। কাজেই সে আপনার পুত্রস্থানীয়। আপনি আপনার পুত্রের ভয় ভাঙ্গিয়ে দিন।

পাগলি এইসব কঠিন কথার কি বুঝল কে জানে, তবে সে হাতে ইশারা করে অনিলকে কাছে ডাকল। অনিল ভয়াবহ আতংকে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। সুরেশ বাগচী বললেন, ছেলে আপনার জন্যে একটা শাড়ি এনেছে, তার মায়ের ব্যবহারী শাড়ি। আপনি গ্রহণ করলে আমরা খুশি হবে।

পাগলী হাত বাড়িয়ে শাড়ি নিল।

সুরেশ বাগচী বললেন, পুত্রের কাছে নগ্ন অবস্থায় উপস্থিত হওয়া শোভন নয়।

আপনি শাড়িটা পরে আমার ছেলের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিন। পাগলি বলল, দূর হ হারামজাদা।

'আমি হাতজোড় করে মিনতি করছি। আপনি তাকে আর ভয় দেখাবেন না। মা-মরা ছেলে, সে জন্ম থেকেই ভীতু। আপনি তার মাতৃস্থানীয়। আপনার ভয়ে সে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।'

পাগলি নিজের গায়ে শাড়ি মেলে ধরতে ধরতে হাসি মুখে বলল, দূর হ, দূর হ কইলাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার! পাগলি আর কোনদিনই অনিলকে ভয় দেখায়নি। লালপেড়ে শাড়ি তাকে কখনো পরতে দেখা যায় নি। সে নগ্ন হয়েই ঘুরত। অনিলকে দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে লাজুক গলায় বলতো — এই পুলা, মাথার চুল আচড়াও না ক্যান? একটা চিরুণী আনবা, চুল আঁচড়াইয়া দিমু। অনিল দৌড়ে পালিয়ে যেত। তার ভয় কাটেনি। শরীরের সমস্ত স্নায়ু অবশ করে দেয়া তীব্র ভয়।

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

অনিলের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কেউ একজন দরজার পাশে তাহলে দাঁড়িয়ে ছিল? কে সে? কে? অনিলের ঘাম হচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'অনিল ঘুমাচ্ছ?'

গফুর সাহেবের গলা। তবু অনিল বলল, কে কে?

'আমি। ভয়ের কিছু নাই। আমি। দরজা খোল।'

অনিল বিছানা ছেড়ে উঠেছে। সুইচ বোর্ড খুঁজে পাচ্ছে না। সমস্ত দেয়াল হাতড়ে বেড়াচ্ছে সুইচ বোর্ডের জন্যে। তার বালিশের নিচে টর্চ লাইট। একবারও টর্চ লাইটের কথা তার মনে আসছে না। তাকে ডাকছেন গফুর সাহেব। সব দক্ষিণের সিঙ্গেল রুমে থাকেন। এজি অপিসের সিনিয়ার এ্যাসিসটেন্ট। এই বছরেই রিটায়ার করার কথা। ঢাকায় বাসা করে থাকতেন। স্ত্রী মারা যাবার পর বাসা ছেড়ে মেসে এসে উঠেছেন। একা মানুষ। বাসা ভাড়া করে এতগুলি ঢাকা নষ্ট করতে ইচ্ছা করে নি। প্রয়োজনও নেই। দু'টি মেয়ে। দু'জনেরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। একজন থাকে রাজশাহীতে, একজন খুলনায়।

সুইচ বোর্ড খুঁজে পাওয়া গেল। অনিল বাতি জ্বালাল, দরজা খুলল। গফুর সাহেব বললেন, ঘুম আসছিল না, এই জন্যেই ডাকলাম। অন্য কিছু না।

'এতক্ষণ ধরে আপনিই কি হাঁটাহাটি করছিলেন?'

'হুঁ। বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। আকাশে খুব মেঘ। তুমি কি চা খাবে অনিল? রাতে ঘুম ভাল হয় না। একটু পরে পরে চা খাই। খাবে?'

'না।'

'আস না একটু, চা খাও। সময় খারাপ। কথা-টথা বললে ভাল লাগে।'

গফুর সাহেব কথাগুলি বলার সময় একবারও অনিলের দিকে তাকালেন না। অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বললেন। কারণ তিনি অনিলের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছেন না। আজ দুপুরে একটা ছেলে অনিলের একটা চিঠি দিয়ে গেছে তাঁর হাতে। চিঠিটা অনিলকে পৌঁছানোর দায়িত্ব তাঁর। সেই খোলা চিঠি তিনি কয়েকবার পড়েছেন। ভয়ংকর দুঃসংবাদের এই চিঠি তিনি অনিলকে দেয়ার মত মনের জোর সংগ্রহ করতে পারেন নি। রূপেশ্বর স্কুলের হেড মাস্টার মনোয়ার উদ্দিন খাঁ লিখেছেন —

বাবা অনিল,

তোমাকে একটি দুঃখের সংবাদ জানাইতেছি। এপ্রিল মাসের নয় তারিখে রূপেশ্বরে পাক মিলিটারী উপস্থিত। তাহাদের আকস্মিক আগমনের জন্যে আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না। তাহারা রূপেশ্বরে অবস্থান নেয়। এপ্রিল মাসের বার তারিখ আরো অনেকের সঙ্গে তাহারা তোমার বাবাকে হত্যা করে। আমরা তাঁহাকে বাঁচানোর সর্বরকম চেষ্টা করিয়াছি। এর বেশি আমি আর কি বলিব? তোমার ভগ্নিকে আমি আমার বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছি। তাহার বিষয়ে তুমি কোন চিন্তা করিবে না। আল্লাহ পাকের নামে শপথ নিয়া বলিতেছি, আমার জীবন থাকিতে আমি অতসী মায়ের কোন অনিষ্ট হইতে দিব না। তোমার পিতার মৃত্যুতে রূপেশ্বরের প্রতিটি মানুষ চোখের জল ফেলিয়াছে। এই কথা তোমাকে জানাইলাম। জানি না ইহাতে তুমি মনে কোন শান্তি পাইবে কি-না। আল্লাহ পাক তাঁহার আত্মার শান্তি দিন, এই প্রার্থনা করি। তুমি সাবধানে থাকিবে। ভুলেও রূপেশ্বরে আসিবার কথা চিন্তা করিবে না। একদল মুক্তিযোদ্ধা রূপেশ্বর থানা আক্রমণ করার চেষ্টা করায় ভয়াবহ ফল হইয়াছে। রূপেশ্বরে বর্তমানে কোন যুবক ছেলে নাই। . . .

গফুর সাহেব ভেবেছিলেন রাতে চিঠিটা দেবেন। এখন অনিলের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে চিঠি না দেয়াই ভাল। ছেলেটা ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। এই খবর পেলে কি করবে কে জানে।

'অনিল।'

'জ্বি।'

'আস আমার ঘরে আস, চা খাও।'

অনিল উঠে এল। গফুর সাহেব কেরোসিনের চুলায় কেতলি বসিয়ে দিলেন। দু'জন মেঝেতে মুখোমুখি বসে আছে। কারো মুখেই কোন কথা নেই।। অস্বস্তি কাটাবার জন্যে গফুর সাহেব বললেন, আজকের পূর্বদেশটা পড়েছ?

অনিল বলল, না। আমি এখন খবরের কাগজ পড়ি না। পড়তে ইচ্ছা করে না।

'আমারো পড়তে ইচ্ছা করে না। অভ্যাসের বসে পড়ি। তবে আজকের পূর্বদেশটা তোমার পড়া উচিত। নাও, এই জায়গাটা পড়। মন দিয়ে পড়।'

'অনিল পড়ল।'

"পাকিস্তানের আজাদী দিবস উপলক্ষে গোলাম আযমের আহ্বান। আযাদী দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলে এক বিশাল সভার আয়োজন করে। সেই সভায় জনাব গোলাম আযম পাকিস্তানের দুশমনদের মহল্লায় মহল্লায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের শান্তি কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।"

'পড়েছ অনিল?'

'জ্বি।'

'তোমার খুব সাবধানে থাকা দরকার। মেসে থাকাটা একেবারেই উচিত না। মিলিটারীর তিনটা টার্গেট — আওয়ামী লীগ, হিন্দু, যুবক ছেলে। তারপর আবার শুনলাম মেসে কারা কারা থাকে তাদের নাম-ধাম পরিচয় জানতে চেয়ে চিঠি এসেছে। কামাল মিয়া বলল।'

'কে চিঠি দিয়েছে?'

স্থানীয় শান্তি রক্ষা কমিটির এক লোক — এস এম সোলায়মান। মজার ব্যাপার কি জান — আগে এই লোক ঘোর আওয়ামী লীগার ছিল। শেখ সাহেবের ভাষণ ক্যাসেট করে নিয়ে এসেছিল। মাইক বাজিয়ে মহল্লায় শুনিয়েছে। এখন সে বিরাট পাকিস্তানপন্থি। মানুষের চরিত্র বোঝা খুব কঠিন। তবে আমি তাকে ঠিক দোষও দিচ্ছি না। সে হয়ত যা করছে প্রাণ বাঁচার জন্যে করছে। এসব না করলে আওয়ামী লীগার হিসেবে তাকে মেরে ফেলত। ঠিক না?'

অনিল কিছু বলল না। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নিঃশব্দে চুমুক দিতে লাগল। চা-টা খেতে ভাল লাগছে। বেশ ভাল লাগছে।

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে? চানাচুর আছে। দেব চানাচুর? টেনশানের সময় খুব ক্ষিধা পায়।'

অনিল বলল, আমি আর কিছু খাব না। চা থাকলে আরেকটু নেব।

গফুর সাহেব আবার কাপ ভর্তি করে দিলেন। নিচু গলায় বললেন, তুমি বরং মেসটা ছেড়ে দাও।

'মেস ছেড়ে যাব কোথায়? ঢাকা শহরে আমার পরিচিত কেউ নেই। ফতুল্লায় এক মামা থাকতেন। এখন আছেন কি–না তাও জানি না।'

গফুর সাহেব হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবার শেষ চিঠি কবে পেয়েছ?

'কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'এম্নি জানতে চাচ্ছি। কোন কারণ নাই।'

'বাবার শেষ চিঠি পেয়েছি চার মাস আগে। এখন কেমন আছেন কিছুই জানি না। আমি বেশ কয়েকটা চিঠি দিয়েছি। জবাব পাচ্ছি না।'

গফুর সাহেব বললেন, যাও শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে। অনিল নিজের ঘরে চলে এল। বাতি নিভিয়ে বিছানায় যাওয়ামাত্র বৃষ্টি শুরু হল। ঝুম বৃষ্টি।

জানালা খুলে একটু বৃষ্টি দেখলে কেমন হয়? কত দিন যে জানালা খুলে ঘুমানো হয় না। আহা কেমন না জানি লাগে জানালা খোলা রেখে ঘুমুতে। দেশ স্বাধীন যদি সত্যি সত্যি হয় তাহলে সে কয়েক রাত রাস্তার পাশে পাটি পেতে ঘুমুবে। যে রাতগুলিতে ঘুম আসবে না সে রাতগুলি কাটাবে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে।

ভাল বৃষ্টি হচ্ছে তো। ঝড় বৃষ্টির সময় মিলিটারীরা রাস্তায় থাকে না। এরা বৃষ্টি ভয় করে। হোক বৃষ্টি। দেশ ভাসিয়ে নিয়ে যাক। পদ্মা–মেঘনা–যমুনায় বান ডাকুক। শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে আসুক জলরাশি।

টক টক শব্দে টিকটিকি ডাকছে। এই ঘরে চারটা টিকটিকি আছে। একটার গা ধবল কুষ্ঠের রুগীর মত সাদা। একটা মাকড়সা আছে। সে সম্ভবত আয়নার পেছনে থাকে। ঠিক রাত আটটায় পেছন থেকে এসে আয়নার উপর বসে থাকে। এমন নিখুঁত সময়ে ব্যাপারটা ঘটে যে মনে হয় মাকড়সাটার নিজের কাছেও কোন ঘড়ি আছে। সম্ভবত টিকটিকিগুলি তাকে খেয়ে ফেলেছে। (সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট) যে ফিট সে টিকে থাকবে।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নীল আলোয় ঘর ভেসে গিয়ে আবার সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। অল্প বৃষ্টি হলেই মেসের সামনের রাস্তাটায় এক হাঁটু পানি হয়। সারারাত বৃষ্টি হোক, রাস্তায় এক কোমর পানি জমে যাক। পানি ভেঙ্গে মিলিটারী জীপ আসবে না। ওরা শুকনো দেশের মানুষ। পানিতে ওদের খুব ভয়।

ঝড় হচ্ছে না–কি? জানালায় শব্দ হচ্ছে। কাকটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। সাধারণত একটা কাক ডাকলে দশটা কাক এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই কাকটা নিঃশসঙ্গ, বন্ধুহীন। এর ডাকে কখনো কাউকে সাড়া দিতে অনিল শুনেনি। সে থাকেও একা একা। তার পুরুষ বন্ধুও তাকে ছেড়ে গেছে। সে কি দরজা খুলে কাকটাকে ভেতরে আসতে বলবে?

ঘুমে অনিলের চোখ জড়িয়ে আসছে। সারাদিন অসহ্য গরম ছিল। এখন পৃথিবী শীতল হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভয় কেটে যাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে — এমন দুর্যোগে মিলিটারী পথে নামবে না। অন্তত আজকের রাতটা মানুষের শান্তিতে কাইবে। অনিল ঘুমিয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার স্বপ্ন দেখল। অনিল যেন খুব ছোট। তারা নৌকায় করে মামার বাড়ি যাচ্ছে। রূপবতী একজন তরুণীর কোলে সে বসে আছে। তার খুব লজ্জা লাগছে। অনিলের বাবা বললেন, ছেলে দেখি লজ্জায় মারা যাচ্ছে। আরে বোকা, এটা তোর মা। মা'র কোলে বসায় এত লজ্জা কি? রূপবতী তরুণীটা বলছে — আহা ও কি আমাকে চিনে? লজ্জা তো পাবেই। এটাই তো স্বাভাবিক। রূপবতী তরুণীর মুখ তখন খানিকটা মোক্তার পাগলির মত হয়ে গেল। এবং সে বলতে লাগল — চিরণীটা কই? দেখি অতসী চিরুণীটা দে তো। আমি বাবুর চুল আঁচড়ে দেই। অতসী খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল, ওকে বাবু ডাকছ কেন? ওর নাম অনিল। তখন কোত্থেকে যেন কাক ডাকতে লাগল — কা–কা–কা।

২

কা কা কা কা। আসলেই কাক ডাকছে।

কাকের চিৎকারে অনিলের ঘুম ভাঙল। জানালা খোলা। গত রাতের ঝড়ে এক সময় ছিটকিনি খুলে গেছে। বৃষ্টির ছাটে বিছানার এক অংশ ভেজা। অনিলের পা-ও ভিজে আছে। তার ঘুম ভাঙেনি। এখন ঘুম ভাঙল কাকের ডাকে। নিঃসঙ্গ কাকটা জানালায় বসে অনিলের দিকে তাকিয়েই ডাকছে। অনিল বিছানা ছেড়ে নামল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। জানালার পাশে চলে গেল। সামান্য আলো হয়েছে। ভোর হচ্ছে। ভোর, নতুন আরেকটি দিনের শুরু।

রাস্তা-ঘাট ফাঁকা। এখানে-ওখানে পানি জমে আছে। পানির উপর দিয়ে ছপ ছপ করতে করতে একটা কুকুর এগিয়ে গেল। শুকনো জায়গাও আছে। কুকুরটা সেদিকে গেল না। পানির উপর দিয়ে হাঁটতেই তার বোধহয় ভাল লাগছে। লাইটপোস্ট-এর ইলেকট্রিক তারে এক ঝাঁক শালিক বসে আছে। ক'টা শালিক সে কি গুনে দেখবে? সুরেশ বাগচী এই ভাবেই তাকে গুনতে শিখিয়েছেন। ট্রেনে করে যাচ্ছে, জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখা গেল টেলিগ্রাফের তারে কয়েকটা ফিঙ্গে বসে আছে। সুরেশ বাবু বললেন, ও বাবু, ও অনিল গুনে ফেল তো বাবা ক'টা পাখি।

অনিল বলল, না। আমি গুনব না।

অতসী বলল, আমি গুনব বাবা?

সুরেশ বললেন, উঁহু উঁহু, অনিল গুনবে। ক'টা অনিল? ক'টা?

গোনার আগেই ট্রেন পাখি ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল। সুরেশ বাগচীর মুখ দেখে তখন মনে হতে পারে — তাঁর খুব ইচ্ছা চেন টেনে ট্রেনটাকে তিনি থামান। পুত্রকে নিয়ে চলে যান হাঁটতে হাঁটতে যাতে সে ফিঙ্গে গুনে আসতে পারে।

শৈশবের অভ্যাসেই অনিল এখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শালিক পাখি গুণছে। পাখি গুলি স্থির হয়ে বসে আছে। পুরোপুরি ভোর না হওয়া পর্যন্ত এরা বোধহয় নড়বে না। কিংবা কে জানে এরা বোধহয় বুঝতে পারছে অনিল নামের ছাব্বিশ বছরের এক যুবক তাদের গুনছে। নড়াচড়া করলে যুবকের গুনতে অসুবিধা হবে।

রাস্তা এখনো ফাঁকা, রিকসা নেই, গাড়ি নেই, একটা মানুষ নেই। কার্ফ্যু সকাল

ছ'টা পর্যন্ত। কাজেই ছ'টার আগে কাউকে দেখা যাবে না। এই সময় রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বললে কেমন হয় — 'আমি কার্ফ্যু মানি না।'

একটা জীপ চলে গেল।

মিলিটারী জীপ। ড্রাইভারের পাশে যে অফিসারটি বসে আছে তার চোখে সানগ্লাস। এই ভোর বেলা, যখন দিনের আলো পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি তখন অফিসারটি চোখে সানগ্লাস পরে বের হল কেন? সে কি চারদিক অন্ধকার করে রাখতে চায়? আশেপাশের কিছু দেখতে চায় না? জানালাটা বন্ধ করে দেয়া উচিত। সব বাড়ির জানালা বন্ধ। তারটা খোলা। সহজেই চোখে পড়ে যাবে। কারো মনে হয়ে যেতে পারে — এই বাড়িতে কোন রহস্য আছে। অনিল জানালা বন্ধ করে ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ভেতরের দিকে মেস ঘরের উঠানে বিশাল এক কাঁঠাল গাছ। মেসের মালিক কামাল মিয়া প্রতিবারই বলেন, গাছ কাটিয়ে ফেলবেন — কোনবারই কাটা হয় না।

সব গাছেরই কিছু নিজস্ব রহস্য আছে। এই গাছেরও আছে। এই গাছে কখনো পাখি বসে না, পাখি বাসা বাঁধে না। অনিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে। গাছের মাথায় রোদ এসে পড়েছে। কাল রাতের বৃষ্টিতে পাতাগুলি ভেজা। সেই ভেজা পাতা রোদে চিকমিক করছে। মনে হচ্ছে গাছটা মাথায় সোনার টোপর পরেছে। কি আশ্চর্য সুন্দর! কি অদ্ভুত সুন্দর! বাবা তার সঙ্গে থাকলে মুগ্ধ হয়ে দেখতেন। বিস্মিত হয়ে বলতেন — আহা রে, আহা রে, কি সুন্দর! কি সুন্দর! এই জিনিসের ছবি আঁকা যাবে না। বুঝলি অনিল, এই জিনিসের ছবি আঁকা খুব সমস্যা।

যে কোন সুন্দর জিনিস দেখলেই সুরেশ বাগচীর প্রথম চিন্তা এটার ছবি আঁকা যাবে কি-না। ভাবটা এ-রকম যেন ছবি আঁকা গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ রং তুলি দিয়ে ছবি এঁকে ফেলতেন।

'দীঘির জলে আকাশের ছায়া' দেখাবার জন্যে সুরেশ বাবু একবার অনিলকে নিয়ে গেলেন। সেটা না-কি একটা দেখার মত ব্যাপার। যার ছবি আঁকা অসম্ভব। অনিলের বয়স তখন ছয় কি সাত। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা। সুরেশ বাগচী বললেন, কষ্ট হচ্ছে না-কি রে বাবু?

অনিল বলল, বাবু বলবে না।

'আচ্ছা যা বলব না। কষ্ট হচ্ছে না-কি রে অনিল?'

অনিল বলল, হুঁ।

'যে কোন ভাল জিনিস দেখার জন্যে কষ্ট করতে হয়। আয় কাঁধে উঠে পড়।'

পাঁচ মাইল দূরে বিরামপুর দীঘি। মহারাজ কৃষ্ণকান্তার কাটা দীঘি। বাঁধানো ঘাট। সুরেশ তাঁর ছেলেকে নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হলেন। লোকজন কাপড় কাচছে, গোসল করছে। তিনি বললেন, আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ঘণ্টা খানেকের জন্য দীঘির জল কেউ নাড়াবেন না। নিস্তরঙ্গ জলে আকাশের ছায়া দেখাবার জন্যে আমি আমার পুত্রকে নিয়ে এসেছি। অনেক দূর থেকে এসেছি।

আধবুড়ো এক লোক বিরক্ত হয়ে বলল, আপনে কেডা?

'আমার নাম সুরেশ বাগচী। আমি একজন শিক্ষক। দীঘির জল ঘণ্টা খানেকের জন্যে না নাড়ালে বড় ভাল হয়।'

'কাজকামের সময় চুপচাপ কে বসে থাকবে বলেন? বিকালে আসবেন।'

'আচ্ছা, আমরা বরং অপেক্ষা করি। অপেক্ষারও আনন্দ আছে। ক্ষিধে পেয়েছে না–কি রে অনিল?'

'না।'

'অতসীকে নিয়ে আসলে ভাল হত। বেচারীর এত শখ ছিল দেখার। ভাবলাম, মেয়ে মানুষ এত দূর হাঁটবে। মেয়ে হলে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তোর ঘুম পাচ্ছে না–কি? ঝিমাচ্ছিস কেন?'

দীঘির ঘাট আর জনশূন্য হয় না। লোকজন আসছেই। দু'ঘণ্টা বসে থাকার পর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ঝুম বৃষ্টি। সুরেশ বাগচী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আর হবে না, চল ফিরে যাই।

ছাতা নেই। ভিজতে ভিজতে ফেরা। রাস্তা হয়েছে পিছল। সুরেশ বাগচীকে ছেলে কাঁধে নিয়ে এগুতে হচ্ছে। তিনি বিড় বিড় করে বলছেন, এ তো বড়ই যন্ত্রণা হয়ে গেল। নির্ঘাৎ জ্বর–জ্বারি হবে।

তারা বাড়ি পৌঁছল সন্ধ্যা মিলিয়ে যাবার পর। সুরেশ বাগচী বাড়ি পৌঁছে শুনলেন তাঁর মেয়ে সারাদিন কিছু খায় নি। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছে। সুরেশ বাগচী উদাস গলায় বললেন, ভুল হয়ে গেছে রে মা। তোকে সঙ্গে নেয়া উচিত ছিল। আমরাও কিছু দেখতে পারি নি। আবার যেতে হবে। তখন নিয়ে যাব। গায়ে হাত দিয়ে বলছি রে মা।

অতসী ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, ভেজা হাত সরাও তো বাবা। নিজেরা সব ভাল ভাল জিনিস দেখবে।

'ভুল হয়ে গেছে রে মা। বিরাট ভুল হয়ে গেছে। তবে আমরা ভাল জিনিস কিছু দেখতেও পাই নি। বিশ্বাস কর। এবার থেকে ভাল জিনিস যা দেখব, তোকে নিয়ে

দেখব।

অনিল কাঁঠাল গাছের মাথার মুকুটের দিকে তাকিয়ে মন ঠিক করে ফেলল। দেশটা ঠিকঠাক হলে এই দেশে যা কিছু সুন্দর জিনিস আছে সে তার বাবাকে আর অতসীদিকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখবে। প্রথম ছ'মাস শুধু ঘুরে বেড়াবে। কোন একটা সুন্দর জিনিসের সামনে বাবাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সে বলবে — বাবা দেখ তো, এর ছবি আঁকা যাবে কি–না। বাবা মাথা নাড়তে নাড়তে বলবেন, অসম্ভব। অতসীদি খিল খিল করে হাসবে। বাবা বিরক্ত হয়ে বলবেন, হাসছিস কেন মা? সৌন্দর্যের একটা অংশ থাকে, কখনো যার ছবি আঁকা যায় না। এই জিনিসটা বুঝতে হবে . . .

গফুর সাহেবের ঘর থেকে কোরান তেলাওয়াতের সুর ভেসে আসছে। তিনি উঠেন অন্ধকার থাকতে থাকতে। নামাজ পড়েন। নামাজের পরে অনেকক্ষণ কোরান তেলাওয়াত করেন। তাঁর গলার স্বর মিষ্টি। পড়েনও খুব সুন্দর করে। প্রায়ই ভোরে অনিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনে। তার ভাল লাগে। শুধু ভাল লাগে বললে কম হয়, বেশ ভাল লাগে।

গফুর সাহেব দরজা খুলে অনিলকে দেখলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, রাতে ঘুম হয়েছিল অনিল?

'জ্বি।'

'আমার এক ফোটা ঘুম হয়নি। সারারাত জেগে কাটালাম। খুব খারাপ লাগছে। গত রাতেও ঘুমাতে পারি নি। এইভাবে দিন কাটালে তো বাঁচব না। কিছু একটা করা উচিত।'

'কি করবেন?'

'তাই তো জানি না। করব কি?'

গফুর সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় বললেন, তোমার একটা খবর আছে অনিল। কাল বিকেলে একটা ছেলে তোমার খুঁজে এসেছিল। অনেকক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আমাকে চিঠিটা দিয়ে গেছে। খুবই দুঃসংবাদ। তোমাকে দুঃসংবাদটা কিভাবে দেব বুঝতে পারছিলাম না। রাতে এই জন্যেই ঘুম হয়নি। সারারাত চিন্তা করেছি। এখন মনে হচ্ছে দুঃসংবাদটা দেয়া উচিত। সব মানুষেরই দুঃসংবাদ জানার অধিকার আছে। মন শক্ত কর অনিল।

অনিল তাকিয়ে আছে। গফুর সাহেব তার কাঁধে হাত রেখে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, তোমরা বাবা মারা গেছেন অনিল। এটা সহজভাবে নেয়ার চেষ্টা কর। আরো অসংখ্য মৃত্যু ঘটবে। এইগুলি নিয়ে আমরা এখন কোন কান্নাকাটি করব না।

দেশ স্বাধীন হোক। দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা চিৎকার করে কাঁদব। নাও চিঠিটা পড়।

অনিল চিঠি পড়ল। তার চোখ শুকনো। মুখ ভাবলেশহীন। অনিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গফুর সাহেবের চোখে পানি এসে গেছে। তিনি পাঞ্জাবীর প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছছেন। অনিল ছেলেটিকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। ভদ্র, লাজুক এবং অতি বিনয়ী ছেলে। কোরান পাঠের পর বারোন্দায় এলে রোজই এই ছেলেকে দেখেন। একদিন সে লাজুক গলায় বলল, আমি চিঠি পেয়েছি আমার বাবা খুব অসুস্থ। নতুন চাকরি, এরা ছুটি দিচ্ছে না। যেতে পারছি না। আপনি কি আমার বাবার জন্যে একটু প্রার্থনা করবেন?

গফুর সাহেব বললেন, অবশ্যই করব, অবশ্যই। আমি খাস দিলে উনার জন্য দোয়া করব। আলাদা নফল নামাজ পড়ব। তুমি মোটেও চিন্তা করবে না। দেখি আস, আস আমার ঘরে, চা খাও। অনিল তার ঘরে এসে কেঁদে ফেলল।

সেই ছেলে বাবার মৃত্যুসংবাদের চিঠি হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চিঠিটা সে দ্বিতীয়বার পড়ে নি। তার চোখ শুকনো। সে তাকিয়ে আছে কাঁঠাল গাছটার দিকে। কে জানে ছেলেটার মনের ভেতর এখন কি হচ্ছে।

গফুর সাহেব নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। আজকের মত কোরানপাঠ তিনি শেষ করেছিলেন। এখন আরো খানিকটা পড়তে ইচ্ছা করছে।

"আলিফ লাম মীম। জা লিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহা, হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন।'

ইহা সেই গ্রন্থ যাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহা বিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শক।

অনিল ঘরে ঢুকল। জানালা খুলে দিল। অন্ধকার ঘর ক্রমে আলো হয়ে উঠছে। আকাশ পরিস্কার। ঝকঝকে নীল। বাতাস মধুর। শ্রাবণ মাসের অপূর্ব সুন্দর একটা সকাল।

অনিল কাপড় পরছে। সে রূপেশ্বর রওনা হবে। তার এখন কেন জানি মোটেই ভয় লাগছে না। চুল আঁচড়াবার জন্য চিরুণী খুঁজতে ড্রয়ারে টান দিতেই একগাদা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। দু'একটা পড়েছে মেঝেতে। অনিলের কাছে লেখা তার বাবা এবং অতসীদির চিঠি। তার কাছে লেখা তার বাবার শেষ চিঠিটিই সে শুধু সঙ্গে নিয়ে যাবে। বাকিগুলি থাকুক যেমন আছে। শেষ চিঠিতে সুরেশ বাগচী লিখছেন —

"বাবা অনিল,

অত্যন্ত বিষণ্ন মনে তোমাকে পত্র দিতেছি। চারিদিকের আবহাওয়া আমার ভাল বোধ হইতেছে না। শংকিত বোধ করিতেছি। মন বলিতেছে এই দেশ বড় ধরনের কোন বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া যাইবে । নিজের জন্যে এবং অতসীর জন্যে আমার কোন চিন্তা নাই। তোমাকে নিয়াই যত ভয়। রাজধানীতে আছ। বিপর্যয়ের প্রথম ধাক্কাটা তোমাদের উপর দিয়াই যাইবে। তুমি ভীতু ধরনের ছেলে, কি করিতে কি করিবে তাহাই আমার চিন্তা। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখিও এবং ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিও। ভুলিও না — মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহার বিরাট জগতের প্রতিটি জীবের কথা ভাবেন। আমাদেরও উচিত তাঁহার কথা ভাবা।

অতসী ভাল আছে। তাহাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করা আমার বড় দায়িত্বের একটি। তেমন সন্ধান পাইতেছি না। তাহার বড় মামা কলিকাতা হইতে পত্র দিয়াছেন যেন আমি অতসীকে কলিকাতা নিয়া যাই। সেইখানে পাত্রের সন্ধান করিয়া বিবাহ দিবেন। আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। অতসী এই দেশের মেয়ে। এই দেশে তাহার বিবাহ হইবে। এই বিষয়ে তোমার ভিন্ন মত থাকিলে আমাকে জানাইবে।

মোক্তার পাগলি মাঝে মধ্যে তোমার সন্ধানে আসে। কিছু দিন পূর্বে কয়েকটা পাকা কামরাঙ্গা নিয়া আসিয়াছিল। তোমাকে দিতে চায়। একজন পাগল মানুষের ভালবাসার এই প্রকাশ দেখিয়া আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। আমি অতসীকে বলিলাম যত্ন করিয়া সে যেন মোক্তার পাগলিকে চারটা ভাত খাওয়াইয়া দেয়। তাহাকে বারান্দায় পাটি বিছাইয়া খাইতে দেওয়া হইল। সে অনেকক্ষণ ভাত মাখাইয়া কিছু মুখে না দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

এই পাগল মানুষটি তোমার প্রতি যে ভালবাসা দেখাইল তাহা তুমি স্মরণ রাখিও। আরেকজন মানুষের কথা স্মরণ রাখিও যিনি তোমার প্রতি কোন ভালবাসা দেখাইবার সুযোগ পান নাই। তিনি তোমার মা। তোমার জন্মমুহূর্তেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মায়েরা সন্তানের জন্যে অসীম ভালবাসা নিয়া আসেন। এই মা সেই অসীম ভালবাসার কিছুই ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া মনে করিও না সেই ভালবাসা নষ্ট হইয়াছে। এই পৃথিবীতে সবই নশ্বর, কিছুই টিকিয়া থাকে না, কেবল ভালবাসা টিকিয়া থাকে।

যদি কখনো বড় বিপদে পড় ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। সেই সঙ্গে তোমার মা'কেও স্মরণ করিবে। ইহাই আমার উপদেশ। পরম করুণাময় তোমার মঙ্গল করুন।

Bdbangla.Org

৩

রেস্টুরেন্টের নাম কিছুদিন আগেও ছিল 'বাংলা রেস্টুরেন্ট।'

এখন নতুন নাম। কায়দে আযম রেস্টুরেন্ট। সাইন বোর্ড ইংরেজী, উর্দু এবং বাংলায় লেখা। সবচে' ছোট হরফ বাংলায়। বাঙ্গালীরা এসব দেখছে। কিছু বলছে না। চুপ করে আছে। ছাব্বিশে মার্চের পর সবাই অতিরিক্ত রকমের চুপ। রেস্টুরেন্টে ফ্রেমে বাঁধাই করা আছে বড় বড় অক্ষরে লেখা "রাজনৈতিক আলোচনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।" তার প্রয়োজন ছিল না। রাজনৈতিক আলোচনা কেউ করছে না। মনে হচ্ছে এ-বিষয়ে এখন কারো কোন আগ্রহ নেই।

অনিল কায়দে আজম রেস্টুরেন্টে নাশতা খেতে এসেছে। ভালমত খেয়ে নেবে, তারপর রওনা হবে টাঙ্গাইলের দিকে। বাস আছে নিশ্চয়ই। পত্রিকায় বার বার লেখা হচ্ছে — 'দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' দুস্কৃতিকারীর খবরও কিছু আছে, তা ভেতরের পাতায়। নিতান্ত অবহেলায় এক কোণে ছাপা। তবু কি করে জানি এই সব খবরের দিকেই চোখ চলে যায়। অনিল চা খেতে খেতে কাগজ পড়ছে।

প্রথম পাতার খবর হল হাজির হওয়ার নির্দেশ। চোখে কালো চশমা, বগলে ব্যান্টন সহ টিক্কা খানের হাসি হাসি মুখের এক ছবির নিচে লেখা — খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক কর্ণেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সরকারী নির্দেশে বলা হয় —

"৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আমি 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে.জে. টিক্কা খান এম.পি.কে., পি এসসি — আপনি কর্ণেল এম.এ.জি ওসমানীকে (অবসরপ্রাপ্ত) আপনার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ১২৩, ১৩১, ও ১৩২ নম্বর ধারা এবং ১০ ও ১৪ নম্বর সামরিক আইনবিধি অনুযায়ী আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যে ১৯৭১ সালের ২০শে আগস্ট সকাল আটটার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীস্থ ১ নম্বর সেক্টরের উপসামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হতে আদেশ দিচ্ছি।

যদি আপনি হাজিরে ব্যর্থ হন তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতেই ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী আপনার বিচার হবে।"

বাণিজ্য, শিল্প ও আইন মন্ত্রী আখতার উদ্দিন আহমেদ সাহেবেরও একটি ছবি ছাপা হয়েছে টিক্কাখানের ছবির নিচে। মন্ত্রী জনসভায় বলেছেন —

"আল্লাহ না করুক, পাকিস্তান যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মুসলমানরা তাদের আলাদা বৈশিষ্ট হারিয়ে ফেলবে এবং হিন্দুদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়বে।"

বক্স করে ছাপা হয়েছে — "সাবধান, গুজব ছড়াবেন না। আপনার গুজব শত্রুকেই সাহায্য করে।"

দু'পৃষ্ঠার খবরের কাগজ এই টুকুতেই শেষ। শেষের পাতায় সামরিক নির্দেশাবলী যা কিছুদিন পর পর ছাপা হচ্ছে। ভেতরের দু'পাতার সবটাই বিজ্ঞাপন। এক কোণায় ছোট করে একটা সংবাদ — শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার ঃ কয়েকজন গ্রেপ্তার।

"গত রোববার রাতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযোগগুলি চালানো হয়।"

গ্রেফতার করা দু'টি ছেলের ছবি ছাপা হয়েছে। ছেলে দু'টির ছেলের বয়স কিছুতেই আঠারো উনিশের বেশি হবে না। দু'জনেরই হাত পেছন দিকে বাঁধা। কিন্তু এদের মুখ হাসি হাসি। ছবি তোলার সময় এরা কি সত্যি হাসছিল না অনিল কল্পনা করছে, এরা হাসছে? এদের নাম দেয়নি, নাম দেয়া উচিত ছিল।

'ভাইজান, খবরের কাগজটা দেখি।'

অনিল তার সামনে বসা মানুষটির দিকে কাগজ এগিয়ে দিল। সেও সব খবর ফেলে এই খবরটিই পড়ছে। একটা খবর পড়তে এতক্ষণ লাগে না। নিশ্চয়ই বার বার পড়ছে। মানুষটার চোখে-মুখে আনন্দের আভা। পত্রিকা বন্ধ করার পরেও সে আরেকবার খুলল, তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। অনিল বলল, কাগজটা আপনি রেখে দেন।

'জ্বি-না, দরকার নাই।'

'রেখে দেন। অন্যকে দেখাবেন।'

লোকটা হেসে ফেলে চাপা গলায় বলল, দুই বাঘের বাচ্চা, কি বলেন ভাইজান?

অনিল বলল, বাঘের বাচ্চা তো নিশ্চয়ই।

'খাঁটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। দেখেন চোখ দেখেন । চোখ দেখলেই বোঝা যায়।'

অনিল আরেকবার তাকাল। ছেলে দু'টির চোখ দেখা যাচ্ছে না। মারের জন্যেই মুখ ফুলে চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে। তবু এর মধ্যেই তেজি চোখ এই মানুষটা দেখতে পাচ্ছে। তাই তো স্বাভাবিক। চায়ের দাম দিয়ে অনিল উঠে পড়ল। সে অফিসে যাবে। বড় সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে রওনা হবে দেশের দিকে। পৌঁছতে পারবে কি–না তা সে জানে না। চেষ্টা করবে।

কি সুন্দর দিন! কি চমৎকার রোদ! শ্রাবণ মাসের মেঘশূন্য আকাশের মত সুন্দর কিছু কি আছে? এই রোদের নাম মেঘভাঙ্গা রোদ। রিকশা নিতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ইচ্ছা করছে। রাস্তা এখনো ফাঁকা। তারচেয়েও বড় কথা রাস্তায় কোন শিশু নেই। এখনকার এই নগরী শিশুশূন্য। বাবা–মা'রা তাঁদের সন্তানদের ঘরের ভেতরে আগলে রাখছেন। শহর এখন দানবের হাতে। শিশুদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

বড় রাস্তার মোড়ে মেশিনগান বসানো একটি ট্রাক। পাশেই জীপ গাড়ি। বিশাল ট্রাকের পাশে জীপটাকে খেলনার মত লাগছে। একজন অফিসার কথা বলছেন একজন বিদেশীর সঙ্গে। বিদেশীর কাঁধে কয়েক ধরনের ক্যামেরা। দু'জনের মুখই খুব হাসি হাসি। এই বিদেশী কি একজন সাংবাদিক? কয়েকদিন আগে অনিল পত্রিকায় পড়েছিল, বিদেশী সাংবাদিকদের আহ্বান করা হয়েছে তারা যেন নিজেদের চোখে দেখে যায় কি সুন্দর পরিবেশ পূর্ব–পাকিস্তানে।

এই লোকটি তাই দেখতে আসছে? সুন্দর পরিবেশ দেখে মোহিত হচ্ছে? কিছুটা মোহিত হতেও পারে। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। বস্তি নেই। ২৫শে মার্চেই বস্তি উজাড় হয়েছে। ভিখিরীও নেই। ভিখিরীরা ভিক্ষা চাইতে কেন বেরুচ্ছে না কে জানে? এরা সম্ভবত ভিখিরীদেরও গুলি করে মারছে।

বিদেশী ভদ্রলোক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অনিলের দিকে। হাত ইশারা করে তিনি অনিলকে ডাকলেন। শুধু অনিল না, আরো কয়েকজনকে তিনি ডেকেছেন। তারা ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছে। অনিল এগিয়ে গেল।

সেনাবাহিনীর অফিসারটি ইংরেজী–বাংলা–উর্দু মিশিয়ে যে কথা বলল, তা হচ্ছে ইনি ইউনাইটেড প্রেসের একজন সাংবাদিক। খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন। তোমাদের যা বলার ইনাকে বল। ভয়ের কিছু নাই। Whatever you want to say, say it. কোই ফিকির নেই। সাংবাদিক ভদ্রলোক একজন দোভাষী নিয়ে এসেছেন।

বিহারী মুসলমান। সে কথা ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিচ্ছে। নীল হাওয়াই সার্ট পরে একজন মানুষকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হল — । প্রশ্নোত্তরের পুরো সময় মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরা থাকল।

'আপনার নাম?'

'আমার নাম মোহাম্মদ জলিল মিয়া।'

'কি করেন?'

'আমি একজন ব্যবসায়ী আমার বাসাবোয় ফার্নিচারের দোকান আছে।'

'দেশের অবস্থা কি?'

'জনাব অবস্থা খুবই ভাল।'

'মুক্তিবাহিনী শহরে গেরিলা অপারেশন চালাচ্ছে, এটা কি সত্য?'

'মোটেই সত্য না।'

'একটা পেট্রল পাম্প তো উড়িয়ে দিয়েছে।'

'এগুলো হল আপনার দুস্কৃতিকারী।'

'আপনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর সন্তুষ্ট?'

'জ্বি জনাব। এরা দেশ রক্ষা করেছে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

'শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?'

'তিনি আমাদের ভুল পথে পরিচালনা করেছেন। ইহা উচিত হয় নাই।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

মাইক্রোফোন এবার অনিলের কাছে এগিয়ে আনা হল।

'আপনার নাম?'

'আমার নাম অনিল। অনিল বাগচী।'

'আপনি কি করেন?'

'আমি একটা ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে কাজ করি। আলফা ইন্সুরেন্স।'

'দেশের অবস্থা কি?'

'দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।'

'কেন বলছেন দেশের অবস্থা খারাপ?'

'স্যার, আপনি নিজে বুঝতে পারছেন না? আপনি কি রাস্তায় কোন শিশু দেখেছেন? আপনার কি চোখে পড়েছে হাসতে হাসতে, গল্প করতে করতে কেউ যাচ্ছে? শহরে কিছু সুন্দর সুন্দর পার্ক আছে। গিয়ে দেখেছেন পার্কগুলিতে কেউ

আছে কি-না? বিকাল চারটার পর রাস্তায় কোন মানুষ থাকে না। কেন থাকে না? স্যার, আমার বাবা মারা গেছেন মিলিটারীর হাতে।'

'কি করতেন আপনার বাবা?'

'তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।'

'আপনি কি আওয়ামী লীগের কর্মী?'

'না, আমি আওয়ামী লীগের কর্মী না।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

সবাই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে অনিলের দিকে। সবচে' বেশি অবাক হয়েছে ফার্নিচার দোকানের মালিক। অনিল একবারও মিলিটারী অফিসারের দিকে তাকাল না। তাকে চলে যেতে বলা হয়েছে। সে চলে যাচ্ছে। ভুলেও পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে এই বুঝি এক ঝাঁক গুলি এসে পিঠে বিঁধল।

ফার্নিচার দোকানের মালিক অনিলের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সে ফিস ফিস করে বলল, জানে বাঁচার জন্যে মিথ্যা কথা বলতে হয় ভাই সাহেব। এতে দোষ নাই। আপনি গলির ভিতর ঢুকে পড়েন। গলির ভিতর ঢুকে দৌড় দিয়া বের হয়ে যান।

অনিল গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। ভদ্রলোক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে লজ্জিত ও বিব্রত মনে হচ্ছে।

অনিল এগুচ্ছে দ্রুত পায়ে। তার মাথায় ঝন ঝন করে বাজছে — বিপদে মিথ্যা বলার নিয়ম আছে। বিপদে মিথ্যা বলার নিয়ম আছে।

সুরেশ বাগচী মিথ্যা বলা বিষয়ে তাঁর ছেলে মেয়েদের একটি গল্প বলেছিলেন। মহাভারতের গল্প। অশোক বনে শর্মিষ্ঠা নামের অতি রূপবতী এক রমণী কিছুকালের জন্যে বাস করেছিলেন। একদিন মহারাজ যযাতি বেড়াতে বেড়াতে চলে এলেন অশোক বনে। শর্মিষ্ঠা তাঁকে দেখে ছুটে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আমার স্বামী নেই, আমি যৌবনবতী, আপনি আমার সঙ্গে রাত্রিযাপন করুন। আমার ঋতু রক্ষা করুন। যযাতি বললেন, তা সম্ভব না। তোমার সঙ্গে শয্যায় গেলে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে। মহা পাপ হবে। শর্মিষ্ঠা বললেন,

"নন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
ন স্ত্রীষু রাজন ন বিবাহকালে
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপথরে
পঞ্চানৃতান্যাহুর পাতকানি"

তার মানে হল, পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না। পরিহাসে, মেয়েমানুষকে খুশি করায়, বিবাহকালে, প্রাণ সংশয়ে এবং সর্বস্ব নাশের সম্ভাবনায়। আপনি আমার সঙ্গে রাত্রিযাপন করলে আমাকে খুশি করবেন। কাজেই আপনার পাপ হবে না। এই কথায় মহারাজ যযাতি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে রাত্রিযাপনে রাজি হলেন।

সুরেশ বাগচী বললেন, গল্পটা কেমন লাগল?

অনিল,অসতী কেউ কিছু বলল না।

'মহারাজ যযাতির কাজটা কি ঠিক হয়েছে?'

অতসী বলল, ঠিক হয় নাই।

'হ্যাঁ, ঠিক হয় নাই। ধর্মগ্রন্থে যাই থাকুক কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যায় না। বাবারা, এটা যেন মনে থাকে।'

অনিল অসম্ভব ভীতু। কিন্তু বাবার চিঠি বুকে নিয়ে সে মিথ্যা বলতে পারছে না। তাকে সত্যি কথাই বলতে হবে। চিঠিটা কি ফেলে দেয়া ভাল না?

৪

আলফা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর হেড অফিস মতিঝিলে।

তাদের অফিস ছোট কিন্তু ব্যবসা ভাল। জাহাজের মালামাল ইনস্যুরেন্স করাই এই কোম্পানীর ব্যবসা। এই ধরনের ব্যবসায় বিশাল অফিস লাগে না। একটা টেলিপ্রিন্টার, আন্তর্জাতিক টেলিফোন লাইন, উপরের মহলের সঙ্গে ভাল যোগাযোগই যথেষ্ট। অল্পকিছু কাজ জানা লোকই যথেষ্ট। কোম্পানীর মালিক জোবায়েদ সাহেব। অবাঙ্গালী। ১৯৫০ সনে বিহার থেকে মোহাজের হয়ে বাবা-মা'র সঙ্গে ঢাকা এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। সেই সময় তাঁদের পরিবারের সম্বল ছিল মায়ের আঠারো ভরি সোনার গয়না। মাত্র কুড়ি বছরের ব্যবধানে সেই বিত্ত ফুলে ফেঁপে একাকার হয়েছে। জোবায়েদ সাহেব আলফা ইস্যুরেন্সের একটা শাখা অফিস খুলেছেন করাচীতে। খুব সম্প্রতি লণ্ডনেও একটা অফিস নেয়া হয়েছে। অফিস চালু হবার আগেই ঝামেলা লেগে গেল। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য রাখছেন। এমনিতেই তাঁর মাথা ঠাণ্ডা। এখন তা আরো অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অফিসের কাজকর্ম নেই বললেই হয়। টেলিপ্রিন্টারের খট খট বেশ কিছুদিন হল শোনা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক লাইন সব সময় ব্যস্ত। লাইন চাইলেই পাওয়া যায় না। গতকাল সারাদিন অপেক্ষা করে করাচীর লাইন পেলেন। তাও কথাবার্তা পরিষ্কার না। করাচী অফিসের নবী বখশ বলল, বাঙ্গালী কুত্তাগুলির খবর কি? কুত্তাগুলির ল্যাজ সোজা হয়েছে?

জোবায়েদ সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টে ব্যবসার কথা তুললেন। জানা গেল ব্যবসা মোটামুটি। খুব খারাপ না, আবার ভালোও না। নবী বখশ আবার বাঙ্গালী প্রসঙ্গ তুলল, ইংরেজীতে যা বলল তার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে — সব বাঙ্গালী পুরুষগুলির বিচি অপারেশন করে ফেলে দেয়া দরকার। বিচি ফেলে দিলেই এরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বিচি গরম হওয়ায় এ-রকম করছে। গরম দেশে গরম বিচি ভাল না।

জোবায়েদ সাহেব চিন্তিত বোধ করছেন। পশ্চিমাদের মনোভাব এই হলে ঝামেলা মিটবে না। তারা বাঙ্গালীদের যতটা তুচ্ছ করছে তত তুচ্ছ করার কিছুই

নেই। বরং এরা জাতি হিসাবে ভয়ংকর। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই বাঙ্গালীগুলিই শুরু করেছিল। যাদের রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না তারা যে পালিয়ে বাঁচল তা গান্ধিজীর জন্যে না। চরকা কাটা, দেশী লবণ খাওয়া এগুলি ফালতু ব্যাপার। বৃটিশ সিংহ চরকা ভয় পায় না। বৃটিশ সিংহ ভয় পেয়েছিল — ক্ষুদিরাম মার্কা ছেলেগুলিকে।

বাঙ্গালীগুলি মহা অলস, একটু ভাল-মন্দ খেতে পারলে মহাখুশি, গল্প করার সুযোগ পেলে খুশি, রাজনীতি নিয়ে দু'একটা কথা বলতে পারলে আনন্দে আত্মহারা, নিজের বউ নিয়ে বেড়াতে যাবার সময় আড়চোখে অন্যের স্ত্রীকে একটু দেখতে পারলে মহা আনন্দিত। তবে এদের রক্তের মধ্যে কিছু একটা আছে। বড় কোন গণ্ডগোল আছে। মাঝে মাঝে এরা ক্ষেপে যায়। কিছু বুঝতে চায় না, শুনতে চায় না। সাহস বলে এক বস্তু যে এদের চরিত্রে নেই সেই জিনিস কোত্থেকে চলে আসে।

জোবায়েদ বুঝতে পারছে সামনের দিন পাকিস্তানীদের জন্যে ভাল না। শুধু ভাল না বললে কম বলা হবে, সামনের দিনগুলি ভয়ংকর। আশ্চর্যের ব্যাপার, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কেউ তা ধরতে পারছে না। এরা এখন মোটামুটি সুপ্ত। দেশ দখলে নিয়ে এসেছে। থানা পর্যায়ে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। চলে এসেছে মিলিশিয়া, রেজার পুলিশ। ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কমাণ্ডো গ্রুপের সুশিক্ষিত সৈন্য। আরো আসছে। জাহাজ আসছে।

সিগন্যাল কোরের কর্নেল এলাহীর সঙ্গে জোবায়েদ সাহেবের সুসম্পর্ক। কর্নেল এলাহীর এক শালাকে তিনি লণ্ডন ব্রাঞ্চের অফিসের দায়িত্ব দিয়েছেন। এলাহী সাহেব মাঝে মাঝে জোবায়েদ সাহেবের অফিসে কফি খেতে আসেন। গল্প-গুজব করে বিদেয় হন। ব্যাপারটা জোবায়েদের পছন্দ না, কারণ শহরের মুক্তিবাহিনী নামক গেরিলারা তৎপর হচ্ছে। কর্নেল এলাহীর এখানে আগমন তাদের চোখে পড়তে পারে। অফিসে বোমা মেরে দেয়া বিচিত্র কিছু না। অবশ্যি জোবায়েদ সাহেব জানেন — গেরিলা তৎপরতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনার এখনো কোন কারণ ঘটেনি। অল্পবয়েসী কিছু ছেলে-পুলে এই কাজটা করছে। গেরিলা জীবনের রোমান্টিক অংশটাই তাদের আকৃষ্ট করছে। তবে এটাকে হেলাফেলা করাও ঠিক না। যুদ্ধে অতি তুচ্ছ ব্যাপারও অবেহলা করতে নেই। ঘোড়ার নালের জন্যে পেরেক ছিল না বলে রাজত্ব চলে গেল। গল্পের রূপক অংশটি অগ্রাহ্য করা ঠিক না।

জোবায়েদ সাহেব ঠিক ন'টার সময় অফিসে আসেন। তাঁর ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন। এক ঘণ্টা পর পর কফি খান। একটা কফি, একটা সিগারেট। বেলা একটার

Bdbangla.Org

মধ্যে পাঁচটা সিগারেট এবং পাঁচ কাপ কফি খাওয়া হয়। একটা বাজার পাঁচ মিনিট পর তিনি অফিস থেকে বের হন। বাড়ি চলে যান। বাকি সময়টা বাড়িতেই থাকেন। বাড়ি থেকে বের হন না। গত দু'মাস ধরে এই তাঁর রুটিন। এক মাস আগে পরিবারের সবাইকে করাচি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধারনা এক সময় হঠাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার চাপ সৃষ্টি হবে। বিমানের টিকিট পাওয়া যাবে না। তাঁর ধারনা সচরাচর ভুল হয় না। তিনি নিজে যাবার কথা ভাবতে পারছেন না। কারণ তাঁর সম্পদ চারদিকে ছড়ানো। সিলেটে চা বাগানে ত্রিশ পার্সেন্ট শেয়ার কেনা আছে। দিলখুশা এলাকায় কিনেছেন পাঁচ বিঘা জমি। এই জমি সোনার খনির মত। বিশ বিঘা জমি নারায়ণগঞ্জে কেনা আছে। একটা ফাক্টরী দেবার কথা ভাবছিলেন। দু'টি বাড়িও ঢাকা শহরে তাঁর আছে। সেই তুলনায় করাচিতে কিছুই নেই। তিনি অতি বিচক্ষণ লোক হয়েও এই বড় ভুলটি করেছেন। সম্পদ এই অংশে তৈরি করে যাচ্ছেন।

দেশ যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়ে যায় তাহলে কি হবে? ইণ্ডিয়া দখল করে নেবে? সেই সম্ভাবনা কতটুক? এখনো বুঝতে পারছেন না। ইণ্ডিয়া কি এত বড় ভুল করবে? মনে হয় না। এই দেশের মানুষগুলির ইণ্ডিয়া প্রসঙ্গে কোন মোহ নেই। যারা ইণ্ডিয়ার আশ্রয় নিয়েছে, তাদের উপর দেশের মানুষ খানিকটা বিরক্ত বলেই মনে হয়।

বড় সাহেবের দরজার পর্দা ফাঁক করে মোবারক ঢুকল। হাসিমুখে বলল, কর্নেল সাব আয়া।

জোবায়েদ সাহেব বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তির কারণ দু'টি। এক, কর্নেল সাহেবের সঙ্গে তিনি কথা বলতে চাচ্ছেন না। দুই, মোবারক এখন আর বাংলা বলছে না। মোবারক অবাঙ্গালী কিন্তু কথা বলত বাংলায়। নিখুঁত ঢাকাইয়া বাংলায়। কিছুদিন হল সে আর বাংলা বলছে না। দাঁত বের করে যখন-তখন হাসছে। মনে হচ্ছে পুরো দেশটা সে তার চকচকে গোলাপী শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে বসে আছে। এখন নিশ্চিত মনে জর্দা দিয়ে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা যায়।

জোবাদের সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, আমাদের কফি দাও।

মোবারক পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে বলল, "কফি তুরন্ত আ যায়ে গি।"

কর্নেল এলাহী শুধু হাতে আসেন নি। একটা চকলেটের টিন নিয়ে এসেছেন। বিদেশী চকলেট, বেশ দামি জিনিস। তিনি কখনো খালি হাতে আসেন না। এর আগের বার এসেছিলেন 'আতর' নিয়ে। তাঁদের ভেতর কথাবার্তা ইংরেজীতে হল।

এলাহী ঃ তোমার মুখ এমন গম্ভীর কেন? ব্যবসার হাল কি ভাল না?

জোবায়েদ ঃ না। ব্যবসা মন্দা।

এলাহী ঃ খুব সাময়িক ব্যাপার। কয়েকটা দিন যাক, দেখবে ব্যবসা হু হু করে বাড়বে।

জোবায়েদ ঃ কয়েকটা দিন মানে কত দিন?

এলাহী ঃ এই ধর তিন মাস।

জোবায়েদ ঃ তিন মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে?

এলাহী ঃ ঠিক তো এখনই হয়ে গেছে। থানায় থানায় আমাদের লোক আছে। এখন হচ্ছে কম্বিং অপারেশন। প্রতিটি মানুষকে এক এক করে দেখা হচ্ছে।

জোবায়েদ ঃ কম্বিং অপারেশনের পর কি হবে?

এলাহী ঃ কি হবে তা কর্তা ব্যক্তিরা ঠিক করবেন। আমি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য। তবে আমার যা অনুমান ওদের শায়েস্তা করার পর একটা রাজনৈতিক সমাধানের দিকে যাওয়া হবে। এক ধরনের আই ওয়াশ আর কি। হা-হা-হা। তখন ওদের যা বলা হবে তাতেই তারা রাজি হবে। 'দুদু খাবে?' —বললে ওরা বলবে, 'খাব'। 'তামাক খাবে?' — বললেও ওরা বলবে, 'খাব'।

জোবায়েদ ঃ তোমাদের অবস্থা তাহলে ভাল।

এলাহী ঃ ভাল মানে? একসেলেন্ট ! Can not be better.

জোবায়েদ ঃ শুনছি তোমরা মেয়েদের উপর অত্যাচার করছ — এটা কি ঠিক?

এলাহী ঃ কোত্থেকে শুনছ? ইণ্ডিয়া বেতার?

জোবায়েদ ঃ হ্যাঁ, বিবিসিও বলছে।

এলাহী ঃ তুমি কি আজকাল প্রপাগাণ্ডা নিউজ শোনা ধরেছ? সবচে' বড় ক্ষতি করছে এই সব প্রপাগাণ্ডা নিউজ।

জোবায়েদ ঃ তাহলে তোমরা মেয়েদের উপর কোন অত্যাচার করছ না?

এলাহী ঃ কিছু কিছু হয়ত হচ্ছে। ওয়ার ফেয়ারে এগুলি হয়। আমরা

তো হাডুডু খেলছি না। যুদ্ধ করছি। এরা আমাদের শত্রুপক্ষ। এই দেশের মেয়েরা তো আমার শ্যালিকা নয়। শ্যালিকাদের সঙ্গেও যেখানে ফষ্টি-নষ্টি করার সুযোগ আছে সেখানে এদের সঙ্গে কেন করা হবে না তুমি আমাকে বল।

কফি চলে এসেছে। কর্নেল এলাহী কফিতে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির ভঙ্গি করল। জোবায়েদ সিগারেট ধরাল। এই সিগারেটটা বাড়তি। আজ একটার ভেতর ছটা সিগারেট খাওয়া হয়ে যাবে। কফিও এক কাপ বেশি খাওয়া হবে। জোবায়েদের বিরক্তি-ভাব বাড়ছে। সে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, কর্নেল এলাহী!

'বলে ফেল।'

'তুমি নিজে কি কোন বাঙ্গালী মেয়েকে রেপ করেছ? ঠিকঠাক জবাব দাও। তোমার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। আগুন হাতে নিয়ে মিথ্যা বলাটা ঠিক হবে না।'

'মিথ্যা বলতে চাচ্ছি এই ধারণা তোমার হল কেন? মিথ্যা বলার তো তেমন প্রয়োজন দেখছি না। মেয়েদের সঙ্গ পেয়েছি এবং পাচ্ছি। তবে আমি বাড়ি থেকে মেয়ে ধরে এনে 'রেপ' করিনি। উপহার হিসেবে আমার কাছে পাঠানো হচ্ছে।'

'কারা পাঠাচ্ছে?'

'এই দেশের মানুষই পাঠাচ্ছে। হা-হা-হা। হিন্দু মেয়েদের সম্পর্কে আমার খানিকটা আগ্রহ ছিল। 'কামাসূত্রা'র দেশের কন্যা, না-জানি কি। মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এরা হচ্ছে মোস্ট অর্ডিনারী। আরেক কাপ কফি দিতে বল। তোমার এখানে দেখি অসাধারণ কফি তৈরি হয়।'

জোবায়েদ আরেক দফা কফি দিতে বলল। আজ সাত কাপ কফি খাওয়া। হবে। সাত কাপ কফি, সাতটা সিগারেট। খুব খারাপ একটা দিনের শুরু হচ্ছে। খুব খারাপ দিন। কর্নেল এলাহী কতক্ষণ এখানে থাকবে বোঝা যাচ্ছে না। মানুষটাকে এই মুহূর্তে অসহ্য বোধ হচ্ছে।

'কর্নেল এলাহী!'

'ইয়েস মাই ফ্রেণ্ড।'

'তুমি কফি খেয়েই বিদেয় হবে। আমার অতি জরুরী কিছু কাজ আছে। তুমি না গেলে তা করতে পারছি না।'

'অফকোর্স বিদেয় হব। রাতে কি তুমি ফ্রী আছ?'

'কেন বল তো?'

'অফিসার্স মেসে ছোট্ট একটা পার্টি হবে। খুব এক্সক্লুসিভ।'

'পার্টিতে যেতে বলছ?'

'হ্যাঁ। তোমার মন মরা ভাব কাটানো দরকার। পার্টিতে সেই চেষ্টা সাধ্যমত করা হবে। সন্ধ্যায় বাসায় থাকবে। আমি নিজে এসে নিয়ে যাব। চমৎকার কফি।'

অনিল বড় সাহেবের জন্যে অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছে। কর্নেল সাহেব বসে আছেন বলে যেতে পারছে না। কয়েকটি কারণে বড় সাহেবের সঙ্গে তার দেখা হওয়া প্রয়োজন। হাতে টাকা-পয়সা নেই। কিছু যদি পাওয়া যায়। তাছাড়া বড় সাহেবকে সে পছন্দ করে। নিজেও জানে না। চাকরির ইন্টারভ্যু দিতে এসে সে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। প্রায় কুড়িজন লোক বসে আছে চাকরির জন্যে। এই কুড়ি জনের মধ্যে তার বিদ্যাই সবচে' কম।

ইন্টারভ্যু বোর্ডে জোবায়েদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে কি কোন প্রশংসাপত্র আছে?

অনিল প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, একটা আছে কিন্তু আমি স্যার দিতে চাচ্ছি না।

'কেন দিতে চাচ্ছেন না?'

'প্রশংসাপত্রটা আমার বাবার দেয়া। আমি কারো কাছ থেকে প্রশংসাপত্র জোগাড় করতে পারি নি, কাজেই বাবাই একটা লিখে দিলেন।'

'কি করেন আপনার বাবা?'

'স্কুল শিক্ষক।'

'প্রশংসাপত্রটা দেখি।'

অনিল খুবই অস্বস্তির সঙ্গে হাতে লেখা কাগজটা এগিয়ে দিল। তার ধারণা ছিল, প্রশংসাপত্রটা পড়ে তিনি হেসে ফেলবেন এবং বোর্ডের অন্য মেম্বারদের দেখাবেন। কারণ প্রশংসাপত্রে লেখা —

যাহার জন্যে প্রযোজ্য

একজন পিতাই তাহার পুত্রকে সঠিক চিনিতে পারেন। মা ভাল চিনিতে পারেন না, কারণ সন্তান নয় মাস গর্ভে ধারণ করিবার কারণে মায়ের চিন্তা ভালবাসায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক। একজন পিতা সেই ত্রুটি হইতে মুক্ত। আমি অনিল বাগচীর পিতা। সেই যোগ্যতায় বলিতেছি — আমার পুত্রের ভেতর সততার মত বড় একটি গুণ পূর্ণ মাত্রায় আছে। সে তেমন মেধাবী নহে। তাহার মেধা সাধারণ মানের। ঈশ্বর মানুষকে পরিপূরক গুণাবলী দিয়ে পাঠান। সেই কারণেই আমার পুত্রের মেধার অভাব পূরণ করিয়াছে তাহার সততা। অন্য কোন গুণ আমি আমার

পুত্রের ভিতর লক্ষ্য করি নাই। যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই বলিলাম।

বড় সাহেব প্রশংসাপত্র ফিরিয়ে দিয়ে শুকনো গলায় বললেন, আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

অনিল বাড়ি চলে এল। দশদিনের মাথায় রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি দিয়ে তাকে জানানো হল যে চাকরি দেয়া হয়েছে। তার পোস্টিং হবে লণ্ডন ব্রাঞ্চে। তবে কাজ শেখার জন্যে তাকে এক বছর ঢাকা অফিসে থাকতে হবে।

অনিল মুখ শুকনো করে বলল, লণ্ডনে আমি গিয়ে থাকব কি করে? অসম্ভব। আমি এই চাকরি করব না। মরে গেলেও না।

এই সংসারে না বলে সহজে পার পাওয়া যায় না। সুরেশ বাগচী স্কুল থেকে রিটায়ার করেছেন। সংসার অচল। অনিলকে ঢাকায় আসতে হল।

মোবারক এসে অনিলকে বলল, কর্নেল সাহেব চলা গিয়া।

অনিল উঠল। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। দিনের আলো থাকতে থাকতে টাঙ্গাইল পৌছানো দরকার। রাস্তাঘাট কেমন কিছুই জানে না।

জোবায়েদ সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। অনিল বলল, স্যার আসব?

'আস।'

'স্যার, আমি একটু দেশে যাব। ছুটি চাচ্ছি।'

'দেশে যাবার মত রাস্তাঘাট কি এখন নিরাপদ?'

'নিরাপদ না হলেও যেতে হবে। আমার বাবাকে স্যার মিলিটারীরা মেরে ফেলেছে। বোনটা আছে অন্য এক বাড়িতে।'

'বস।'

অনিল বসল। জোবায়েদ সাহেব নিয়ম ভঙ্গ করে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমি শুনেছি রাস্তাঘাট এখন মোটেই নিরাপদ না। আমি শুনেছি বাস থেকে যাত্রীদের নামানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যাদের কথাবার্তায় এরা সন্তুষ্ট হয় না তাদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।

'আমিও শুনেছি স্যার।'

'এই অবস্থায় রিস্ক নেয়া কি ঠিক? বেঁচে থাকাটা জরুরী। ইচ্ছে করে রিস্ক নেয়া বোকামী।'

রহমত থাকে। এই শিশুর কারণে ইনশাআল্লাহ কারো কিছু হবে না। আমরা জায়গামত নিরাপদে পৌছব।

বাবার মুখে আনন্দের আভা দেখা গেল। মা'র মুখেও নিশ্চয়ই আনন্দের হাসি। বোরকার কারণে সে হাসি দেখা যাচ্ছে না। বাচ্চার কান্না এখন আর কারো খারাপ লাগছে না, বরং ভাল লাগছে। কাঁদুক সে, কাঁদুক। গলা ফাটিয়ে কাঁদুক।

একজন জিজ্ঞেস করল, ছেলে না মেয়ে?

বাবা লাজুক গলায় বলল, মেয়ে।

কি নাম রেখেছেন মেয়ের?

বাবা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'মুক্তি।' বলেই অস্বস্তি নিয়ে চারদিকে তাকালেন। সেই অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল যাত্রীদের সবার চোখে-মুখে।

'ভাল নাম কি?'

'ভাল নাম ফারজানা ইয়াসমিন।'

'মিলিটারী নাম জিজ্ঞেস করলে ভাল নামটা বলবেন। ডাক নাম বলার প্রয়োজন নাই।'

বাচ্চাটা কান্না থামিয়েছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গের বোরকা পরা মহিলার কান্না শোনা যাচ্ছে। বৃদ্ধ তাকে এখন আর পাখার হাওয়া করছেন না। গাড়ির ভেতর প্রচুর হাওয়া। বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মনে হচ্ছে তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছেন। আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। রোদে তেজ নেই। বাতাস আর্দ্র, বৃষ্টি আসবে বলে মনে হচ্ছে। রাস্তা ভাল না, গাড়ি খুব ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ঝাঁকুনিতে অনেকেরই ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

যাত্রীদের প্রায় সবার হাতেই কিছু না কিছু বই। বেশ কয়েকজনের হাতে কোরান শরীফ। অনেকের হাতে প্রচ্ছদে কায়দে আযমের ছবিওয়ালা বই। এই সব বই এখন খুব বিক্রি হচ্ছে। এইসব বই হাতে থাকলে একধরনের ভরসা পাওয়া যায়। মনে হয়, বিপদ হয়ত বা কাটবে।

প্রচণ্ড গরমে স্যুট পরা একজন বাসযাত্রী যাচ্ছেন। লাল রঙের টাই, থ্রি পিস স্যুট। কোটের পকেটে লাল গোলাপের কলি। তেকোনা লাল রুমাল। সঙ্গে একটা 'ব্রীফ কেস।' তিনি ব্রীফ কেস কোলে নিয়ে বসেছেন। এক মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করছেন না। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে গেলেন বখশি হাট বাজারের কাছে তাকে নামিয়ে দেয়া যাবে কি-না। তখনো ব্রীফ কেস হাতে ধরা। ভদ্রলোককে খুব নার্ভাস মনে হচ্ছে, খুব ঘামছেন। একটু পর পর রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন, ঘাড় মুছছেন।

জানালা দিয়ে ঘন ঘন থুথু ফেলছেন। তাঁর সঙ্গে পানির বোতল আছে। মাঝে মাঝে বোতল থেকে পানি খাচ্ছেন।

এই প্রচণ্ড গরমে স্যুট পরে আসার রহস্য হল তিনি শুনেছেন মিলিটারীরা ভদ্রলোকদের তেমন কিছু করে না। স্যুট পরা থাকলে খাতির করে। তারপরেও তিনি ঢাকা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছেন। চিঠিতে লেখা – – 'মোহাম্মদ সিরাজুল করিম, পিতা মৃত বদরুল করিম, গ্রাম বখশি হাট, আমার পরিচিত। সে পাকিস্তানের একজন খাদেম। দেশ ভক্ত এক ব্যক্তি। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় সে জীবন কোরবান করতে সর্বদা প্রস্তুত। আমি তাহার সর্বাঙ্গিন মঙ্গল কামনা করি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

এত কিছুর পরেও ভদ্রলোক স্বস্থি পাচ্ছেন না। এক সময় দেখা গেল গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে তিনি বিকট শব্দে বমি করছেন।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি এগুচ্ছে। গাড়ির গতি বেশি না। এত খারাপ রাস্তায় গতি বেশি দেবার প্রশ্ন উঠে না।

ঢাকা থেকে বেরুবার মুখেই একটা চেকপোস্ট। চেকপোস্টে মিলিশিয়ার কিছু লোকজন। ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। যাত্রীরা শক্ত হয়ে বসে আছে। কেউ জানালা দিয়ে তাকাচ্ছে না। গাড়ির ভেতর কোন রকম শব্দ নেই। শুধুমাত্র ঘুমন্ত আয়ুব আলির নাক ডাকার শব্দ আসছে। বোরকা পরা মহিলাও কান্না থামিয়েছেন।

মিলিশিয়াদের একজন হাত ইশারা করে গাড়ি চালিয়ে যেতে বলল। কেউ এসে গাড়ির ভেতর উঁকি পর্যন্ত দিল না। কি অসীম সৌভাগ্য ! গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ছোট বাচ্চাটি কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদুক। ছোট বাচ্চারা তো কাঁদবেই।

রাস্তা এখন কিছুটা ভাল। ড্রাইভার গাড়িতে স্পীড দিতে শুরু করেছে। তাকে দ্রুত যেতে হবে। সন্ধ্যার আগে আগে টাঙ্গাইল পৌঁছতে হবে।

মুক্তি কাঁদছে। হাত-পা ছুড়ে কাঁদছে। মুক্তি যার নাম, অবরুদ্ধ নগরীতে যার জন্ম, সে তো কাঁদবেই। কাঁদাটাই তো স্বাভাবিক।

৬

আয়ুব আলি অনিলের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর ছোট মেয়েটি অনিলের কোলে, সেও ঘুমুচ্ছে। আয়ুব আলি সাহেবের স্ত্রী বোরকার পর্দা তুলে ফেলে কৌতূহলী হয়ে চারপাশ দেখছেন। তাঁর মুখভর্তি পান। এরা বেশ সুখে আছে বলেই অনিলের মনে হল।

এই দেশ ছেড়ে সময়মত চলে যেতে পারলে অনিলরাও কি সুখে থাকত? ১৯৬৫ সনে ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে গেল। তখন অনেকেই চলে গেল। অনিলের ছোট কাকা বরুন বাগচী তাদের একজন। রূপেশ্বরে তিনি পাকা বাড়ি তুলেছিলেন, দোতলা বাড়ি। বাড়ির পেছনে পুকুর। চুপি চুপি সব বিক্রি করলেন। কেউ কিছুই জানল না। যে কিনল সেও কোন শব্দ করল না।

ছোট কাকার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। টুকটাক ব্যবসা করেই কি করে যেন ধাই করে একদিন তিনি বড়লোক হয়ে গেলেন। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক কমে গেল। তবু যাওয়া-আসা ছিল। কিন্তু তারা যে সব বিক্রি করে কোলকাতায় চলে যাচ্ছে এই সম্পর্কে কিছুই বলেনি। যে-রাতে যাবে সে-রাতে বরুন বাগচী একা তাদের বাড়িতে বেড়াতে এল। তেমন শীত না, তবু সারা শরীর চাদরে ঢাকা।

সুরেশ বাবু বাংলা ঘরে বসে ছাত্র পড়াচ্ছিলেন, সেখান থেকেই বললেন — কি খবর বরুণ?

'তোমার সাথে একটু কথা আছে দাদা। ভেতরে আস।'

'ছাত্র পড়াচ্ছি তো।'

'একদিন ছাত্র না পড়ালে তেমন ক্ষতি হবে না। জরুরী কথা।'

সুরেশ বাগচী অপ্রসন্ন মুখে উঠে এলেন। বরুণ গম্ভীর গলায় বলল, তোমার পুত্র-কন্যাদেরও ডাক। কথাবার্তা সবার সামনেই হোক। এরা ছোট হলেও এদেরও শোনা দরকার। নয়ত বড় হয়ে আমাকে দোষ দিবে।

'তোর ব্যাপার তো কিছুই বুঝতেছি না।'

Bdbangla.Org

বরুণ বসল খাটে পা তুলে। তার গলার স্বর এমনিতেই ভারী। সে-রাতে আরো বেশি ভারী শোনাল।

'তোমার ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার কথা কিছু ভাবছ?'

সুরেশ বাবু অবাক হয়ে বললেন, শুধু শুধু ইণ্ডিয়া চলে যাবার কথা ভাবব কেন?

'অনেকেই তো যাচ্ছে।'

'অনেকে কেন যাচ্ছে তাও তো বুঝি না।'

'কেন বুঝছ না? বেশিদিন মাস্টারী করলে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায় জানি, এতটা পায় তা জানতাম না।'

'মাস্টারীর দোষ দেয়ার প্রয়োজন নাই। তুই কি বলতে চাস বল্।'

বরুন চাপা গলায় বলল, এই দেশ আমাদের থাকার জন্য না।'

'কেন না? তুই তো ভালই আছিস। ব্যবসা-বাণিজ্য করছিস। দোতলা দালান দিয়েছিস।'

'তা দিয়েছি মনের শান্তির বিনিময়ে দিয়েছি। মনে শান্তি নাই।'

'শান্তি না থাকার মত কি হল?'

'দাদা, তুমি বুঝতে পারছ না, এই দেশে আমরা সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন।'

সুরেশ বাগাচী হাসতে হাসতে বললেন, নিজেকে সেকেণ্ড ক্লাস ভাবলেই সেকেণ্ড ক্লাস। তুই এ-রকম ভাবছিস কেন? আমাকে দেখ। আমি তো ভাবি না।'

'দাদা, সত্যি করে বল তো — তুমি কোন রকম অনিশ্চয়তা বোধ কর না?'

'না করি না। কেন করব?'

'কি আশ্চর্য কথা! একটা প্রশ্ন করলেই তুমি উল্টা প্রশ্ন করছ। আমি তো তোমার ছাত্র না।'

'তোর হয়েছে কি সেটা বল।'

'দাদা, তোমাকে সত্যি কথা বলি, এই দেশে মনটা ছোট করে থাকতে হয়।'

'যার মন ছোট, সে যে দেশেই যাক তার মন ছোটই থাকবে।'

'খবরের কাগজে দেখেছ আরতী বালা নামের এক মেয়েকে কিছু প্রভাবশালী লোক ধরে নিয়ে গেছে, সাতদিন পর ছেড়েছে?'

'শুধু হিন্দু মেয়েদের এ-রকম হচ্ছে তা তো না, মুসলমান মেয়েদের বেলায়ও হচ্ছে। হচ্ছে না? এমন যদি হত শুধু হিন্দু মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটছে তাহলে

ভিন্ন কথা হত। তা ঘটছে না। আরতী বালাকে নিয়ে খবরের কাগজে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। ব্যাপারটা সবার খারাপ লেগেছে বলেই হয়েছে।'

'এটা একটা জঘন্য দেশ দাদা।'

'তুই যেখানে যাচ্ছিস সেটা কি খুব উন্নত কিছু? সেখানে এমন হচ্ছে না? সমস্যা তো দেশের না, সমস্যা মানুষের। দেশ মন্দ হয় না। মাটি কি কখনো মন্দ হয়?'

বরুন রাগী গলায় বলল, আমাকে এইসব বড় বড় কথা বলবে না দাদা। আমার এইসব বড় বড় কথা শুনতে বিরক্তি লাগে।

'আচ্ছা ঠিক আছে, আর বড় বড় কথা বলব না। তুই একটু সহজ হয়ে বসতো। তোর মাথা গরম হয়েছে। গা থেকে গরম চাদরটা খোল। লেবুর সরবত খাবি? অতসী তোর কাকাকে লেবুর সরবত করে দে।'

'আমি কিছু খাব না।'

'তুই কি অকারণে রাগরাগি করার জন্যে এসেছিস?'

বরুন কঠিণ গলায় বলল, দাদা, আমি ঠিক করেছি — কোলকাতা চলে যাব।

'কি বললি?'

'শুনলেতো কি বললাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোলকাতা চলে যাব।'

সুরেশ বাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুই সিদ্ধান্ত নিয়েছিস। আমি কিছু বললে তো সিদ্ধান্ত পাল্টাবি না। আমাকে বলা অর্থহীন।'

'তোমাকে বলছি, কারণ তোমাকে খবরটা জানানো দরকার।'

'আচ্ছা যা, আমি জানলাম।'

'তোমাকে সবাই স্যার স্যার করে, খাতির ক'রে, কাজেই তুমি আছ একটা ঘোরের মধ্যে। আসল সত্য তোমার অজানা। এই দেশের সেনাবাহিনীতে কোন হিন্দু নেয়া হয় না, এটা তুমি জান?'

'না, জানতাম না।'

'এখন তো জানলে। এখন বল কি বলবে?'

'এরা যে নিচ্ছে না এটা এ-দেশের মানুষদের বোকামী। দেশের সব সন্তানের সমান অধিকার। অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এক ধরনের ভুল। সেই ভুলের জন্য দেশকে কেন দায়ী করব?'

'কাকে দায়ী করবে?'

'যেসব মানুষ এই ভুল করছে তাদের দায়ী করব।'

'শুধু দায়ী করবে, আর কিছু না?'

'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যেন তারা ভুল বুঝতে পারে।'

'ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রার্থনা শুনবেন?'

'শোন্ বরুণ, আমি বুঝতেই পারছি না কেন তুই এত রেগে আছিস। কেউ কি তোকে কিছু বলেছে?'

'না। দাদা, আমি চলে যাচ্ছি।'

'সেটা তো শুনলাম। কবে যাচ্ছিস?'

'আজই যাচ্ছি। আজ রাত এগারোটায়।'

সুরেশ বাগচী দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে বললেন, আজ রাত এগারোটায় তুই চলে যাচ্ছিস আর আমাকে সে-খবর দিতে এখন এসেছিস? বাড়িঘর কি করবি?

'বাড়িঘর বিক্রি করে দিয়েছি।'

'কখন বিক্রি করলি?'

'মাস খানিক হল। সব চুপি চুপি করতে হল। জানাজানি হলে সমস্যা হবে।'

'আমাকেও জানালি না!'

'একজন জানলে সবাই জানবে।'

সুরেশ বাগচী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এই দেশের কাউকেই তুই বিশ্বাস করিস না। শ্রী রামকৃষ্ণের একটা কথা আছে না?

কচ্ছপের মত মানুষ। তুই হচ্ছিস সে রকম। কচ্ছপ থাকে জলে কিন্তু ডিম পাড়ে ডাঙ্গায়। তুই থাকিস এক দেশে আর মন পড়ে থাকে অন্য দেশে। কাজেই তোর চলে যাওয়াই ভাল। তবে তুই যে শেষ সময়ে আমাকে খবরটা দিতে এলি তাতে মনে দুঃখ পেয়েছি।

'তোমাকে আগে বললে লাভটা কি হত?'

সুরেশ বাগচী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কোন লাভ হত না। যাচ্ছিস যা। ঐখানে মন টিকবে না। মানুষ গাছের মত। মানুষের শিকড় থাকে। শিকড় ছিড়ে যাওয়া ভয়ংকর ব্যাপার। গাছ ছিড়লে যেমন মারা যায়, মানুষও মারা যায়। গাছের মৃত্যু দেখা যায়। মানুষেরটা দেখা যায় না। তুই দুঃখ পাবি।

'দুঃখ তুমিও পাবে দাদা। দু'দিন পর বুঝবে কি বোকামী করেছ। হিন্দু-মসুলমান দাঙ্গা লাগবে, ঘরে আগুন দিবে।'

'এইটা কখনো হবে না বরুণ। আমি কোনদিন এদের অবিশ্বাস করিনি। এরাও করবে না। তুই এখন যা, তোর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

বরুন তারপরেও চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইল। তাকাল অতসীর দিকে। নিচু গলায় বলল, অতসী, আমি কি অতসীকে নিয়ে যাব?

'ওকে নিতে চাস কেন?'

'ওর ভাল বিয়ে দেব। এই দেশে ওর জন্যে ছেলে পাবে না।'

'তুই চলে যা বরুন। এগারোটার সময় যাবি দশটা প্রায় বাজে।'

'তুমি আজ বুঝতে পারছ না দাদা। একদিন বুঝবে। মর্মে মর্মে বুঝবে।'

বরুণ চলে গেল। সুরেশ বাবু বারান্দায় সারা রাত বসে রইলেন। সেই রাতে তিনি উপবাস দিলেন। মন বিগড়ে গেলে শরীরকে কষ্ট দিয়ে মন ঠিক করতে হয়। সুরেশ বাগচী ঠিক করলেন আগামী দিনও তিনি নিরম্বু উপবাস দেবেন।

বাসের ঝাঁকুনিতে অনিলেরও ঘুম পেয়ে গেল। ঘুমের মধ্যেই মনে হল, সে দিন ছোট কাকার সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে গেলে তার বাবার এই বিপদ হত না। বাবা বেঁচে থাকতেন। তবে অনিল এও জানে, কোন উপায়ে সে যদি বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারত — বাবা, তোমার কি মনে হচ্ছে দেশ ছেড়ে গেলে তোমার জন্যে ভাল হত? থেকে যাওয়াটা বোকামী হয়েছে। তাহলে তিনি জবাব দিতেন — অনিল, এই বিপদ কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর আসেনি, সারা দেশের উপর এসেছে। আমার মৃত্যু এমন কোন বড় ব্যাপার না বাবা। তাছাড়া তোমার হেড স্যার কি তোমাকে লেখেন নি আমার মৃত্যু সংবাদে রূপেশ্বরের হাজার হাজার মানুষ চোখের জল ফেলেছে। মানুষের ভালবাসায় আমার মৃত্যু। এই দুর্লভ সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

৭

সবাই এক সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল। বসে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বাম দিকে খানিকটা হেলে টাল মাটাল অবস্থায় এগুচ্ছে। ড্রাইভার প্রাণপণে ব্রেক করতে করতে বলল, হারামীর পুত তোর মা'রে আমি. . .

বাসের একটা টায়ার ফেটে গেছে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারত ঘটে নি। ফাঁকা রাস্তা বলেই সামলানো গেছে। হেল্পার বলল, সব নামেন, গাড়ি খালি করেন। যার যার পিসাব করা দরকার পিসাব করেন।

অনিল নামল। আয়ুব আলি সাহেবের কনিষ্ট কন্যাকে কোলে বসানোয় অনিলের পায়ে ঝি ঝি ধরে গেছে। একটু হাঁটা হাঁটি করা দরকার। এত ঝাঁকুনিতেও আয়ুব আলির ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি। তিনি আরাম করেই ঘুমুচ্ছেন। বাকি যাত্রীরা সবাই নেমে পড়েছে। শুধু মহিলারা গাড়িতে বসা। অনিলের সঙ্গে পাপিয়ার নামার ইচ্ছা ছিল। বাবার ভয়ে নামতে পারে নি।

অনিল ঘাসের উপর বসে সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেটে টান দিয়ে সে টের পেল আজ সারা দিনে দু'কাপ চা ছাড়া কিছু খায়নি। সিগারেটের ধোয়া পেটে পাক দিচ্ছে, বমি ভাব হচ্ছে। ভয়ংকর সময়েও ক্ষুধা নামক বিষয়টি মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। ফাঁসির আসামী ফাঁসির তিন ঘণ্টা আগে খেতে চায়। ফাঁসির আসমীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় — শেষ ইচ্ছা কি? বেশির ভাগই না-কি খাবারের কথা বলে।

স্যুট পরা ভদ্রলোক হাতে ব্রীফকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে। একটা ট্রাক হর্ন দিল। তিনি ভয়ানক চমকে উঠলেন। অনিল তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সরে গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে চান না।

'মহসিন সাহেব। এই যে মহসিন।'

অনিল তাকাল। আয়ুব আলি তাকেই ডাকছেন। অনিলের মনে ছিল না তার নতুন নামকরণ হয়েছে। আয়ুব আলি বাস থেকে নেমেছেন। এখন তাঁর চোখে সান গ্লাস। এই সানগ্লাস আগে ছিল না।

'মহসিন।'

'আমাকে বলছেন?'

'আপনাকে ছাড়া কাকে বলব? এরমধ্যে ভুলে গেছেন? শুনে যান এদিকে, আর্জেন্ট কথা আছে।'

অনিল এগিয়ে গেল। আয়ুব আলি গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে বললেন, অবস্থা খুব খারাপ।

'কেন?'

'দুই বোরকাওয়ালীর সঙ্গে এক বুড়ো অছে না? এরা বিহারী!'

'কে বলল আপনাকে?'

'আপনারা সব নেমে গেলেন। হঠাৎ শুনি এই দুই বোরকাওয়ালী বেহারী ভাষায় কথা বলছে। শুনেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অমিতো সহজ পাত্র না, কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম — আপনারা কি বিহারী? কথা বলে না। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন কি করা যায় বলেন তো?'

'করার কি আছে?'

'বোকার মত কথা বলবেন না। স্পাই যাচ্ছে বুঝতে পারছেন না। আমি কান্না দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম — এটা বাঙ্গালী কান্না না। একেক জাতির কান্না একেক রকম। বাঙ্গালীর কান্না বিহারী কাঁদতে পারে না। কিছু একটাতো করা দরকার।'

'আপনি চুপচাপ থাকুন। কিছুই করার নেই।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম। পথে মিলিটারী, কিছু করা ঠিক হবে না। টাঙ্গাইলে নেমে না হয় বুড়োকে কানে ধরে উঠ-বোস করাবো। ঘরের শত্রু বিভীষণ।'

অনিল কিছু বলল না। শরীরটা খারাপ লাগছে। এতক্ষণ বমি-বমি ভাব ছিল, এখন সত্যি বমি আসছে। বমি করে ফেলতে পারলে শরীরটা বোধ হয় ভাল লাগত। বমি হওয়ার জন্যেই অনিল আরেকটা সিগারেট ধরাল।

'মহসিন সাহেব।'

'জ্বি।'

'ট্রিকস করে বুড়োর কাছ থেকে জানব না-কি ব্যাপারটা কি?'

'কি দরকার?'

'তাও ঠিক। কি দরকার? তার উপর আবার বুড়ো মানুষ। জোয়ান হলে পাছায় লাথি দিয়ে নালায় ফেলে দিতাম।'

বাসের চাকা বদল করা হচ্ছে। জ্যাকে কি এক সমস্যা। জ্যাক উপরে উঠছে

না। ড্রাইভার এবং হেল্পার দু'জনেই অনেক কায়দা কানুন করছে। লাভ হচ্ছে না। পাপিয়া জানালা দিয়ে হাত ইশারা করে তার বাবাকে ডাকল। অপ্রসন্ন মুখে আয়ুব আলি এগিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন তার চেয়েও অপ্রসন্ন মুখে। থু করে একদলা থুথু ফেলে বললেন, মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাওয়াই উচিত না। কথায় আছে না– পথে নারী বিবর্জিতা। এইসব কথাতো আর এম্নি এম্নি লোকজন বানায় না। দেখে শুনে বিচার বিবেচনা করে বানায়।

'কি হয়েছে?'

'পাপিয়ার মা না–কি আসার সময় পানি বেশি খেয়েছিল, এখন বাথরুমে যাওয়া দরকার। তার জন্যে পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট পথের মাঝখানে বাথরুম বানিয়ে বসে আছে। আমি পাপিয়ার মা'কে বললাম — চুপ করে বসে থাক। একটা কথা না। বেশি কথা আমি নিজে বলি না, বেশি কথা শুনতেও পছন্দ করি না।

অনিল বলল, বাস এখানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বলে মনে হয়। কাছেই একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে সেখানে নিয়ে গেলে হয়।

'কে নিয়ে যাবে, আমি?'

'আপনি যেতে না চাইলে আমি নিয়ে যাই।'

'মহসিন সাহেব, আপনার বয়স অল্প। আপনাকে একটা কথা বলি। মেয়েছেলের সব কথার গুরুত্ব দিবেন না। গুরুত্ব দিয়েছেন তো মরেছেন। এদের কথা এক কান দিয়ে শুনবেন, আরেক কান দিয়ে বের করে দেবেন। আচ্ছা এই শালারা একটা চাক্কা বদল করতে গিয়ে ছয় মাস লাগিয়ে দিচ্ছে ব্যাপার কি?'

অনিল, আয়ুব সাহেবের স্ত্রী, তাঁর দুই কন্যা এবং হাতাহাতি বিশারদ দুই পুত্রকে নিয়ে রাস্তার ওপারে বাড়িটার দিকে এগুচ্ছে। ভদ্রমহিলা পুরো ব্যাপারটায় খুব লজ্জা পাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে দু'টি বাস থেকে বের হতে পেরে উল্লাসিত। তারা ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। সেই সব কথা বোঝার উপায় নেই। অল্প বয়স্ক বালিকাদের যে সব কোড ল্যাংগুয়েজ আছে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে। ছেলে দু'টি নীরব।

ভদ্রমহিলা কিছুটা গ্রাম্য টানা টানা স্বরে বললেন, পাপিয়ার বাবা আপনারে বিরক্ত করতেছে?

অনিল বলল, না।

ভদ্রমহিলা নীচু গলায় বললেন, আপনে কিছু মনে নিয়েন না। মানুষটা পাগলা কিসিমের কিন্তু অন্তর খুব ভাল।

'মনে করার কিছু নেই।'

'কথা বেশি বলে কিন্তু বিশ্বাস করেন খুব ভাল মানুষ।'

'আম বিশ্বাস করছি। কেন বিশ্বাস করব না।'

পাপিয়া বলল, ছোট বেলায় বাবার টাইফয়েড হয়েছিল। তারপর থেকে বাবা কথা বেশি বলে।

পাপিয়ার মা, কড়া গলায় বললেন, চুপ কর।

সম্পন্ন গৃহস্তের টিনের বাড়ি। কিন্তু বাড়িতে কোন মানুষ জনের সাড়া নেই। অনেক ডাকাডাকি পর কামলা শ্রেণীর একজন লোক বের হয়ে এল। তার কাছ থেকে জানা গেল রাস্তায় দু'পাশে অনেক দূর পর্যন্ত বাড়ি ঘরে কোন মানুষ থাকে না। রাস্তা দিয়ে মিলিটারী যাতায়ত করে। বেশ কয়েকবার ট্রাক থামিয়ে তারা রাস্তার আশে পাশের বাড়ি ঘর গুলিতে ঢুকেছে।

অনিল বলল, বাড়িতে ঢোকে কি চায়?

লোকটা কিছু বলল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অনিল বলল, ওরা কি টাকা পয়সা চায়?

'না। মেয়ে ছেলের সন্ধান করে।'

'সে কি?'

'অছিমদ্দিন মেম্বার সাহেবের বউ আর ছোট শালীরে ট্রাকে উঠায়ে নিয়া গেছে। তারার আর কোন সন্ধান নাই।'

'অছিমদ্দিন মেম্বার সাহেবের বাড়ি কোনটা?'

'বাড়ি দূর আছে। এই খান থাইক্যা ধরেন চাইর মাইল।'

'মিলিটারী কি রোজই যতায়ত করে?'

'হুঁ। যাতায়ত বাড়ছে।'

বাসের চাকা লাগানো হয়ে গেছে। বাস হর্ন দিচ্ছে। বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। বাসে ফিরতে ফিরতে সবাই আধভেজা হয়ে গেল। বাস যখন ছাড়ল তখন মুষল ধারে বৃষ্টি। দু'হাতে দূরের জিনিস দেখা যায় না এমন অবস্থা। আয়ুব আলি আনন্দিত গলায় বললেন, বৃষ্টিটা নেমেছে আল্লার রহমতের মত। বৃষ্টিতে মিলিটারী বের হবে

Bdbangla.Org

না। চেকিং ফেকিং কিছুই হবে না। হুস করে পার হয়ে যাব।

বাস চলছে খুব ধীরে। উইণ্ড শিল্ড দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না, ধীরে চলা ছাড়া উপায় নেই। অয়ুব আলি বললেন, আমি সামনে গিয়ে বসি, এইখানে খুব ঝাঁকুনি। মহসিন সাহেব আপনি পা তুলে আরাম করে বসেনতো।

অনিল পা তুলে বসল। তেমন আরাম হল না। ক্ষুধা কষ্ট দিচ্ছে। শরীর ঝিম ঝিম করছে। আয়ুব আলি সাহেবের স্ত্রী, বোরকার পর্দা তুলে দিয়েছেন। স্বামী পাশে নেই এখন একটু সহজ হওয়া যায়। তিনি অনিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, পান খাইবেন?

'না।'

'একটা খান। মিষ্টি পান। জর্দা দেওয়া নাই।'

অনিল পান হাতে নিল। ভদ্রমহিলা সুখী সুখী গলায় বললেন, ভাইয়ের বিয়ায় যাইতেছি। শ্রাবণ মাসের দশ তারিখ বিবাহ।

'আমি শুনেছি।'

'মেয়ে খুব সুন্দরী। ছবি আছে দেখবেন?'

'দেখি।'

'ও পাপিয়া তোর নতুন মামীর ছবি দেখা।'

পাপিয়া ছবি দিল। পাপিয়ার মা হাসি মুখে বললেন, গায়ের রঙ খুব পারিষ্কার, ছবিতে তেমন আসে নাই।

পাপিয়া বলল, তুমিতো দেখ নাই মা। সব শোনা কথা।

'ছোট চাচা দেখছেন। ছোট চাচা বলছেন — বক পাখির পাখনার মত গায়ের রঙ। ছোট চাচা মিথ্যা বলার মানুষ?'

অনিল ছবির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। কি সুন্দর ছবি। গোলগাল মুখ। মাথাটা বাঁ পাশে হেলানো। বেণী বাঁধা চুল। টানা টানা চোখে রাজ্যের বিস্ময় ও আনন্দ। সামান্য ছবি. এত কিছু ধরতে পারে?

'সুন্দর না ?'

'হ্যাঁ সুন্দর। খুব সুন্দর।'

'আমার ভাইও সুন্দর। ও পাপিয়া তোর মামার ছবি দেখা।'

পাপিয়া আগ্রহ করে মামার ছবি বের করল। অনিলের এই ছবিটি দেখতে ইচ্ছে করছে না। অসম্ভব রূপবতী তরুণীর পাশে কাউকে মানবে না। পৃথিবীর সবচে রূপবান তরুনকেও তারপাশে কদাকার লাগবে। কি আশ্চর্য মেয়েটাকে এখন

অতসীদি'র মত দেখাচ্ছে। অবিকল অতসীদির হাসির মত হাসি। অতসীদির চোখের মত চোখ। অসতীদির মতই গোল মুখ। কে জানে হয়ত এই মেয়েটোর নামও অতসী। অনিল পাপিয়াকে বলল, তোমার নতুন মামীর নাম কি? পাপিয়া হাসতে হাসতে বলল, অহনা।

'কি নাম বললে, অহনা?'

'জ্বি। আমার আব্বা বলে — গহনা। হি হি হি . . .'

অনিলের এই সুখী পরিবারটিকে ভাল লাগছে। অসম্ভব ভাল লাগছে।

সবচে দুঃখের সময় আনন্দময় কল্পনা করতে হয়। সুরেশ বাগচী বলতেন, বুঝলি অতসী মানুষ কি করে জানিস? সুখের সময় সে শুধু সুখের কল্পনা করে। একটা সুখ তাকে, দশটা সুখের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুঃখের সময় সে শুধু দুঃখই কল্পনা করে। এটা ঠিক না। উল্টোটা করতে হবে।

অতসীদি বলতো, তুমি বুঝি তাই কর?

'সব সময় পারি না। তবে চেষ্টা করি। খুব আনন্দের কিছু যখন ঘটে তখন তোর মা'র কথা ভাবি। ইশ্ বেচারী এই আনন্দ দেখার জন্যে নেই . . . তখন চোখে জল এসে যায়।'

'খুব আনন্দের কিছু কি তোমার জীবনে ঘটে বাবা?'

'অবশ্যই ঘটে। কেন ঘটবে না।'

'আমিতো আনন্দের ঘটনা কিছু ঘটতে দেখি না। কবে ঘটল বলতো? একটা ঘটনা বল।'

'ঐতো সেদিনের কথাই ধর। তোর দুই ভাই বোন খুব হাসহাসি করছিস। দেখে আমার মনটা আনন্দে ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তোর মা'র কথা ভাবলাম। একা একা খানিকক্ষণ কাঁদলাম।'

'বাবা, তোমার কি কোন গোপন দুঃখ আছে?'

সুরেশ বাগচী হাসতে হাসতে বললেন, না মা আমার সব প্রকাশ্য দুঃখ। তোর বুঝি সব গোপন দুঃখ?

অতসী হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। তারপরেই খিল খিল করে হেসে ফেলল।

অনিল তার দিদির অনেক গোপন দুঃখের খবর জানে না। শুধু একটি জানে। সেই দুঃখটা ভয়াবহ ধরনের। এই দুঃখের কথা পৃথিবীর কাউকেই জানানো যাবে না। কোনদিন এটা নিয়ে আলোচনাও করা যাবে না। এই দুঃখ দূর করারও কোন উপায় নেই। কিছু গোপন দুঃখ আছে যা চিরকাল গোপন থাকে।

অতসী দির বিয়ের কথা উঠলে সে বলবে, আমি কিন্তু বিয়ে করব না। শুধু শুধু তোমরা চেষ্টা করছ।

'কেন করবে না দিদি?'

'কেন করব না সে কৈফিয়ত তোর কাছে দিতে হবে? তুই কে? তুই কি আমার গুরু মশাই? করব না করব না, ব্যাস।'

'বিয়ে যদি ঠিক ঠাক হয়ে যায় তুই কি করবি?'

'আমি তখন ছেলেটাকে দশ লাইনের একটা চিঠি লিখব। বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।'

অনিল ঠিক জানে না তবে তার অনুমান অতসীদি এ রকম একটা চিঠি লিখেছে। নয়ত নেত্রকোনার উকিল সাহেবের ছেরেল সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে যেত না। সব ঠিক ঠাক। ওদের মেয়ে খুব পছন্দ। পণের কোন ব্যাপার নেই। উকিল সাহেব বিনা পণে ছেলের বিয়ে দেবেন। তাঁদের বংশের এরকম ধারা। ছেলের মা এবং বোনরা এসে আশীর্বাদ করে গেল।ে ছলের মা অতসীকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন এবং বললেন, এই মেয়েটাতো মানুষ না। এতো দেবী দূর্গা। এখন থেকে আমরা এই মা'কে আমি দুর্গা ডাকব।

সেই বিয়ে ভেঙ্গে গেল। ছেলে সুরেশ বাগচীকে লোক মারফত একটি চিঠি পাঠাল। তাতে লেখা —

প্রণাম নিবেন। বিশেষ কারণে আমার পক্ষে বর্তমানে বিবাহ করা সম্ভব হইতেছে না। আপনি কিছু মে করিবেন না। আম অত্যন্ত দুঃটখত।

মে করিবেন না। আম অত্যন্ত দুঃখিত।

সুরেশ বাগচী বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপারটা কি? আমিতো কছুই বুঝলাম না। ব্যাপারটা কি?

বাস হর্ন দিচ্ছে। যাত্রীরা সচকিতে হয়ে উঠেছে। সামনেই মিলিটারী চেক পোস্ট। দু'জন মিলটারী রেইন কোট গায়ে রাস্তায় দু'পাশের দাঁরিয়ে আছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। পরিস্কার দিন।

৮

মুক্তি চেঁচিয়ে কাঁদছে। তাকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। মুক্তির বাবা মুক্তিকে কাঁধে নিয়ে দুলাচ্ছেন। কান্না কমার বদলে তাতে তার কান্না আরো বেড়ে যাচ্ছে।

স্যুট পরা ভদ্রলোক আবার বমি করছেন। এবার বমি করছেন গাড়ির ভেতর। তিনি গাড়ি প্রায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। বিকট শব্দ হচ্ছে।

কালো পোশাক পরা একজন মিলিশিয়া উঁকি দিল। তার চেহারায় যথেষ্ট মায়া আছে। গলার স্বরও কোমল, অথচ সে কুৎসিত একটি বাক্য বলল, "শোয়ার কি বাচ্চা, সব উতারো।" ছাব্বিশ জন যাত্রী এই বাসে। ছাব্বিশ জনের ভেতর একজনও বলতে পারল না — কেন অকারণে গালি দিচ্ছেন। সবাই এমন মুখ করে আছে যেন এই গালি তাদের প্রাপ্য। শুধু আয়ুব আলির চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল। আয়ুব আলির স্ত্রী চাপা গলায় বললেন, তোমার পায়ে ধরি। তুমি উল্টাপাল্টা কিছু বলবা না। আমি তোমার পায়ে ধরি। ভদ্রমহিলা সত্যি সত্যি স্বামীর পা চেপে ধরলেন। প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, পুলাপানের কসম লাগে, উল্টাপাল্টা কিছু বলবা না।

মহিলা যাত্রী ছাড়া বাকি সবাইকে লাইন করে দাঁড় করানো হয়েছে। স্যুট পরা ভদ্রলোক শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। তিনি ঝকঝকে স্যুট নিয়ে কাদার উপর বসে আছেন। তাঁর হেঁচকি উঠছে। ব্রীফকেস এখনো তার হাতে ধরা।

অনিল লক্ষ্য করল তল্লাশির পুরো ব্যাপারটা মিলিটারীরা এক ধরনের খেলার মত নিয়েছে। মজার কোন খেলা, যেখান থেকে আনন্দ পাওয়া যায়। অন্তত এরা সবাই যে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছে তা বোঝা যাচ্ছে। সবার ঠোঁটের কোনেই হাসি কিংবা হাসির আভাস। এরা নিজেরা তীব্র ভয়ের মধ্যে আছে। অন্যের ভয় থেকে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা তারা করবে, তা বলাই বাহুল্য। ভীত মানুষকে আরো বেশি ভয় পাইয়ে দেবার প্রবণতাও মানুষের মজ্জাগত।

মিলিটারী দলের প্রধান একজন অল্পবয়স্ক অফিসার। সে দূরে একটা টুলে বসে আছে। এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই, এরকম একটা

ভাব। তল্লাশি দলের সঙ্গে একজন দোভাষী থাকে। এদের সঙ্গেও আছে। এই দোভাষী বিহারী নয়, বাঙ্গালী। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসী একজন মানুষ। সার্ট প্যান্ট পরা। চোখে চশমা। তাকেও খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে। সে খানিকটা দূরে বসে কলা খাচ্ছে। তার সামনে একটা মগ। মগভর্তি চা।

তল্লাশি দল স্যুট পরা মানুষটার কাছে চলে এল। তাকেই যে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তা বোঝাই যাচ্ছিল।

একজন সুবাদার শীতল গলায় বলল, ডরতা কেঁউ?

লোকটি সুন্দর উর্দুতে বলল, ভয় পাচ্ছি না। আমার শরীর খারাপ। কয়েকবার বমি হয়েছে। এই জন্যে দাঁড়াতে পারছি না।

কথাবার্তা সব উর্দুতে হল।

'তুমি বাঙ্গালী?'

'জ্বি জনাব বাঙ্গালী।'

'নাম?'

'আবু হোসেন।'

'কলেমা জান?'

'জ্বি। চার কলমা জানি।'

'নামাজ পড়?'

'নামাজ পড়ি।'

'উর্দু কোথায় শিখেছ?'

'আমরা ছোট বেলায় রাওয়ালপিণ্ডি ছিলাম। বাবা রেলওয়েতে কাজ করতেন।'

'বাবার নাম কি?'

'ইসমাইল হোসেন।'

'তুমি পাকিস্তান ভালবাস?'

'জ্বি বাসি।'

'ব্রীফকেসে কি আছে?'

'কিছু কাগজপত্র আছে। জমির দলিল।'

'ব্রীফকেস খোল।'

'ব্রীফকেসের চাবি আনতে ভুলে গেছি জনাব।'

সুবাদারের মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা একজনকে কি যেন বলল। উর্দু নয় অন্য কোন ভাষায়। সম্ভবত পশতু। সে ব্রীফকেস নিয়ে গেল।

ব্রীফকেস ভাঙ্গা হতে লাগল। পুরো দলটি গভীর আগ্রহে ব্রীফকেস ভাঙ্গা দেখছে। তাদের সবার চোখে মুখে স্পষ্ট আনন্দের ছাপ। টুলে বসে থাকা অফিসারও আগ্রহ বোধ করছে। সে উঠে এসেছে ব্রীফকেস ভাঙ্গা দেখতে। স্যুট পরা লোকটি আবার বমি করছে। হড় হড় করে বমি। তার বমির দৃশ্যেও মিলিটারীর দল আগ্রহ বোধ করছে। এতেও যেন তারা খানিকটা মজা পাচ্ছে।

ব্রীফকেস ভাঙ্গা হয়েছে। একটা জমির দলিল, কিছু কাগজপত্র, দাড়ি সেভ করার যন্ত্রপাতি, একটা গায়ে মাখা সাবান। খামে ভরা কিছু টাকা। উল্লেযোগ্য পরিমাণের নয়। ছয় সাত শ' হবে। মিলিটারীর তল্লাশি দলটির আশা ভঙ্গ হল। অফিসারটিও বিরক্ত হয়েছে। সে কঠিন গলায় বলল, এ মুসলমান কি-না ভালমত জিজ্ঞেস কর। চেহারা হিন্দুর মত।

অফিসারের কথায় দলটির মধ্যে আবার খানিকটা আগ্রহ দেখা গেল। সুবাদার বলল, কলেমায়ে শাহাদৎ বল।

আবু হোসেন গড় গড় করে কলেমায়ে শাহাদৎ বলল।

'খাৎনা হয়েছে?'

'জ্বি।'

'প্যান্ট খোল।'

আবু হোসেন অতি দ্রুত প্যান্ট খুলে ফেলল। যেন এর জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। প্যান্ট খুলে দেখাতে পেরে যেন খানিকটা আরাম পাচ্ছে। বিপদ বুঝি-বা কাটল। সুবাদার সাহেব বলল, যাও ক্যাপ্টেন সাহেবকে দেখিয়ে আস। আবু হোসেন প্যান্ট খোলা অবস্থাতেই ক্যাপ্টেন সাহেবের সামনে গেল। ক্যাপ্টেন সাহেব উদাস দৃষ্টিতে একবার তাকালেন, তারপর হাত ইশারায় চলে যেতে বললেন। আবু হোসেন তার ভাঙ্গা ব্রীফকেস নিয়ে বাসে উঠল এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। এমন শান্তির ঘুম সে অনেকদিন ঘুমায় নি।

জিজ্ঞাসাবাদ এখন বেশ তাড়াতাড়ি হচ্ছে। দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করেই ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। কারোর প্যান্ট খোলা হচ্ছে না। একজনকে শুধু বলা হল একশ বার কানে ধরে উঠ-বোস করতে। এবং যতবার উঠে দাঁড়াবে ততবার বলবে, 'জয় বাংলা'।

শুধুমাত্র একজন যাত্রীর জন্যে এটা কেন করা হল তা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত মজা করার জন্যেই। উঠ-বোসের পর্ব সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হচ্ছে। যাকে উঠ-বোস করতে বলা হয়েছে, সে এই কাজটি বেশ আগ্রহ নিয়ে করছে বলে মনে হল।

ক্যাপ্টেন সাহেব তেমন আগ্রহ বোধ করছেন না। তার চোখ বিষণ্ন।

অনিল এবং আয়ুব আলি লাইনের শেষ মাথায়। সুবাদার সাহেব অনিলের পাশে এসে দাঁড়াল। বাঙ্গালী দোভাষীর চা খাওয়া শেষ হয়েছে। সে এসে সুবাদারের কাছে দাঁড়াল।

'কি নাম?'

'অনিল। অনিল বাগচী।'

হতভম্ব আয়ুব আলি বললেন, 'ঠিক নাম বলেন। ঠিক নামটা স্যারকে বলেন। স্যার ইনার আসল নাম মোহাম্মদ মহসিন। বাপ মা আদর করে অনিল ডাকে।'

'তোমার নাম মোহাম্মদ মহসিন?'

অনিল চুপ করে রইল। আয়ুব আলি হড়বড় করে বললেন, আমার খুবই পরিচিত স্যার। দূর সম্পর্কের রিলেটিভ হয়। খাঁটি মুসলমান।

বাঙ্গালী দোভাষী বলল, অনিল হইল হিন্দু নাম।

আয়ুব আলি হাসি মুখে বললেন, একুশে ফেব্রুয়ারীর জন্যে এটা হয়েছে ভাইসাহেব। বাপ মা'রা আদর করে ছেলেমেয়েদের বাংলা নাম রাখে। যেমন ধরেন – – সাগর, পলাশ। ছেলেপুলের তো কোন দোষ নাই, বাপ মায়ের দোষ।

বাঙ্গালী দোভাষী এবার যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছে বলে মনে হল। সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, এই দুইটাই হিন্দু। মিথ্যা কথা বলতেছে।

ক্যাপ্টেনের চোখে-মুখে খানিকটা উৎসাহ ফিরে এসেছে। সে অনিলের কাছে উঠে এল। ইংরেজীতে বলল, তুমি হিন্দু?

অনিল বলল, ইয়েস স্যার।

'তুমি মুক্তিবাহিনীর লোক?'

'না স্যার।'

'আওয়ামী লীগ?'

'না।'

'মুজিবের পা-চাটা কুকুর। মুজিবের পা কখনো চেটে দেখেছ? কেমন লাগে পা চাটতে?'

অনিল চুপ করে রইল। ক্যাপ্টেন বলল, একে ঘরে নিয়ে যাও।

আয়ুব আলি ব্যাকুল গলায় বললেন, স্যার আমার একটা কথা শুনেন স্যার। যে কেউ একবার কলেমা পড়লেও মুসলমান হয়ে যায়। এটা হাদিসের কথা। মহসিন কলেমা জানে। তারে জিজ্ঞেস করেন। সে বলবে।

ক্যাপ্টেন আয়ুব আলির দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, তুমি নিজে মুসলমান?

'জ্বি জনাব, মুসলমান। সুন্নি মুসলমান। আমরা পীর বংশ। আমার দাদা মরহুম মেরাজ উদ্দিন সরকার পীর ছিলেন।'

বাঙ্গালী দোভাষী বলল, এই হারামীও হিন্দু। বিরাট ধড়িবাজ।

আয়ুব আলির চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে ঘাড় ফিরিয়ে বাসের দিকে তাকাল। বাস থেকে এখানকার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। তবে বাসের প্রতিটি মানুষ ভীত চোখে এই দিকেই তাকিয়ে আছে। আয়ুব আলী সাহেবের স্ত্রী এবং বড় মেয়েটি কাঁদতে শুরু করেছে। সবচে ছোট মেয়েটি জানালায় হাত বাড়িয়ে ভীত গলায় বলছে — আব্বু আস, আব্বু আস।

বাঙ্গালী দোভাষী আয়ুব আলির দিকে তাকিয়ে বলল, প্যান্ট খোল্। প্যান্ট খুলে দেখা খৎনা হয়েছে কিনা। স্যারকে দেখা।

আয়ুব আলি কঠিন গলায় বললেন, প্যান্ট যদি খুলতে হয় তাহলে আমি তোর মুখে পিসাব করে দেব। আল্লার কসম আমি পিসাব করব।

অনেকক্ষণ পর ক্যাপ্টেন মনে হয় কিছুটা মজা পেল। সে শব্দ করে হেসে ফেলল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে অন্যরাও হেসে ফেলল। শুধু বাঙ্গালী দোভাষী হাসল না। সে অন্যদের হাসির কারণও ঠিক ধরতে পারছে না। সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ। ক্যাপ্টেন আয়ুব আলির দিকে তাকিয়ে বলল, যাও, গাড়িতে গিয়ে উঠ।

আয়ুব আলি বললেন, স্যার মহসিন সাহেবকে নিয়ে যাই?

'ও থাকুক। তোমাকে উঠতে বলেছি, তুমি উঠ।'

আয়ুব আলি ব্যথিত চোখে অনিলের দিকে তাকালেন। অনিল শান্ত গলায় বলল, আমার বড় বোন আছেন রূপেশ্বর হাইস্কুলের হেডমাষ্টার সাহেবের বাড়িতে...

আয়ুব আলি অনিলের কথা শেষ করতে দিলেন না। ছেলে মানুষের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বলতেছি, মাটির কসম খেয়ে বলতেছি, আপনার যদি কিছু হয় আমি আপনার বোনকে দেখব, যতদিন বাঁচব দেখব। বিশ্বাস করেন আমার কথা। বিশ্বাস করেন।

'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। আপনি আমার বোনকে বলবেন, আমি ভয় পাই নাই। আর তাকে বলবেন আমি বলে দিয়েছি — সে যেন তার পছন্দের ছেলেটাকে বিয়ে করে। কে কি বলে এটা নিয়ে সে যেন চিন্তা না করে।'

আয়ুব আলি গাড়িতে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের কান্না আরো বেড়ে গেল। বড় মেয়েটি বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছে। সে থর থর করে কাঁপছে।

বাস ছেড়ে যাবার আগ-মুহূর্তে ক্যাপ্টেন সুবাদারের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যুট পরা লোকটাকে রেখে দাও। ঐটাও বদমাশ। ওর কিছু একটা মতলব আছে — টের পাওয়া যাচ্ছে না।

আবু হোসেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে আছে। কিছুতেই তাকে টেনে নামানো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে তার গায়ে অসুরের শক্তি। জীবন থাকতে সে বাসের হ্যাণ্ডেল ছাড়বে না। আবু হোসেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে — ভাইসাহেব, আপনারা আমাকে বাঁচান। ভাইসাব, আপনারা সবে মিলে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন।

আবু হোসেনকে নামানো হয়েছে। সে হাত পা ছড়িয়ে রাস্তার পাশে পড়ে আছে। বাস ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন হাই তুলল। সুবদারকে বলল, এই দু'জনকে নদীর পাড়ে নিয়ে যাও।

'এখন নিব?'

'না রাতে। রাতই ভাল।'

ক্যাপ্টেন আবার হাই তুলল। তার ঘুম পাচ্ছে।

৯

খুব জ্যোৎস্না হল সে রাতে। উথাল-পাথাল জ্যোৎস্নার ভেতর তারা অনিলকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবু হোসেনকে নেয়া হচ্ছে না। কারণ তাকে নেয়ার প্রয়োজন নেই। মুগ্ধ হয়ে জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে অনিল যাচ্ছে। দোভাষী বাঙ্গালী যাচ্ছে তার পাশে পাশে । অনিল তাকে বলল, কি সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে দেখেছেন? এই সৌন্দর্যের ছবি আঁকা সম্ভব নয়। সৌন্দর্যের একটি অংশ আছে যার ছবি আঁকা যায় না।

প্রচণ্ড জ্যোৎস্নার কারণেই বোধ হয় কাকদের ভেতরে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। তারা ডাকতে লাগল — কা-কা-কা।

❁❁❁

Bdbangla.Org